জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র

বুলেটিন নং ২৯ ॥ ১১ বর্ষ ॥ ডিসেম্বর ২০০২ ॥ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস সংখ্যা ॥

সম্পাদকীয়

তনয় দেওয়ান

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতি

সজীব চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং সাম্প্রতিক একটি অপহরণ ঘটনা

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল অব্যাহতভাবে চলছে

পাল্পউড বা মন্ডোপযোগী নরম কাঠের বাগান/সেটেলারদের দ্বারা উচ্ছেদের মুখে সাপমারা গ্রাম/বান্দরবানে লীজ প্রদান/ভূষণছড়া হেডম্যানের জমিতে মসজিদ নির্মাণ

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসন অব্যাহতভাবে চলছে

বরকল উপজেলায় সেটেলার গ্রাম সম্প্রসারণ/পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ/সদ্য অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার তালিকাভূক্ত হচ্ছে/সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সাম্প্রদায়িক ও চুক্তিবিরোধী বক্তব্য

বিশেষ প্রতিবেদন

তিন পার্বত্য জেলায় আসন্ন ইউপি নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবী

সাংগঠনিক প্রতিবেদন

জনসংহতি সমিতির ৭ম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত/১০ নভেম্বর মহান নেতা এম এন লারমা স্মরণে স্মরণ সভা/পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে ঢাকায় আলোচনাসভা ও তিন পার্বত্য জেলায় গণ-সমাবেশ/আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের অধিবেশনে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি/কাচালং কলেজের নবীনবরণে সন্তু লারমা

সংবাদ প্রবাদ

সেনা নির্যাতনের শিকার পিসিপি সদস্য মিলন চাকমা/ইউপিডিএফ কর্তৃক সরকারী শিক্ষক বিমল চন্দ্র চাকমা অপহৃত/বালুখালীর বাদলছড়িতে ইউপিডিএফ চক্রের সন্ত্রাস/ইউপিডিএফ কর্তৃক চা বাগানের ম্যানেজার অপহৃত/ইউপিডিএফ কর্তৃক ইউপি সদস্য অপহরণ/সুমন সহায়তা তহবিল গঠনে বাধাপ্রদান ও মারধোর/রেডিও নেদারল্যান্ডস-এ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন/শোক সংবাদ।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বাণী/বিবৃতি

Message of the UN High Commissioner for Human Rights

Statement by the Indigenous Caucus

সম্পাদকীয়

গত ১০ ডিসেম্বর পালিত হলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। এই দিনে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ও ঘোষিত হয় সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ। এই ঘোষণার মাধ্যমে মানব জাতি অর্জন করে বিশ্বমানবতার এক বলিষ্ঠ দলিল। এই ঘোষণাপত্র বিশ্বের সকল মানুষের সামনে তুলে ধরেছে তাদের প্রাপ্য ন্যূনতম মৌলিক অধিকারসমূহ। এই সনদে বর্ণিত অধিকার বা অনুচ্ছেদসমূহ আদালতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে বলবৎযোগ্য না হলেও সনদের রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। বিভিন্ন রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠনসমূহ এই সনদের আলোকে আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি, প্রটোকল ও রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে সত্যিকার অর্থে তাগিদ অনুভব করছে। সার্বজনীন মানবাধিকার সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যের আত্মমর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য সম অধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বের স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও শান্তির মূল ভিত্তি। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সাধারণ পরিষদ এই ঘোষণাকে সকল মানুষ ও জাতির জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের প্রতিটি অংশকে এই অধিকার ও স্বাধীনতার মর্যাদা বিধান এবং এগুলোর সার্বজনীন স্বীকৃতি ও প্রয়োগ করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হতে হবে বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, গোটা বিশ্বে মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় তথা মানবাধিকার আজ ভূলুণ্ঠিত। একক জাতির রাষ্ট্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও তাদের মানবাধিকারগুলো অস্বীকার করা হচ্ছে। যার নজির আজ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রতিনিয়ত প্রতীয়মান হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের অধিকারসহ সমগ্র বাংলাদেশের আদিবাসী, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আজ সর্বক্ষেত্রে পদদলিত ও ভূলুণ্ঠিত তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

'মানবাধিকারের প্রতি অশ্রদ্ধা আর অবমাননা বর্বরতাকেই উস্কে দেয় আর ধ্বংস করে মানবিক মূল্যবোধ' - সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের মুখবন্ধে উল্লেখিত বাণী আজ বিশ্বের দেশে দেশে প্রতীয়মান হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার ও অবমাননা করে বিগত সময়ে জুম্ম জনগণের উপর যে নির্মম গণহত্যা ও তাদের ভূমি বেদখল করা হয়েছে তা পশুর বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করে চুক্তিকে যেভাবে অবমাননা ও পদদলিত করা হচ্ছে তা কখনোই মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক নয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরও বিগত পাঁচ বছরে জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতি পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে। 'অপারেশন উত্তরণ'-এর মতো সেনাশাসন জারী রেখে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর চালানো হচ্ছে নির্যাতন, নিপীড়ন, গ্রেপ্তার ও জেল-জুলুম। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সেটেলার কর্তৃক অব্যাহতভাবে চলছে জুম্ম জনগণের চিরাচরিত ভূমি বেদখল, নারী অপহরণ, ধর্ষণ ও সাম্প্রদায়িক হামলা। সর্বোপরি সরকারী বাহিনী কর্তৃক ইউপিডিএফ নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মদদ দানের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের উপর চালানো হচ্ছে নির্বিচারে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা। চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত পাঁচ বছরে সশস্ত্রবাহিনী, সেটেলার ও ইউপিডিএফ কর্তৃক নির্মম খুন হয়েছে ৮৪ জন, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১২৭ জনকে এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ৪৬৪টি বাড়ীঘরে।

বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, মানবাধিকার হলো রাজনৈতিক অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। তাই ৫৪তম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে সরকারের প্রতি আহ্বান - পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অচিরেই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করুন এবং চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতিসংঘ সদস্যভূক্ত একটি দেশ হিসেবে সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ বাস্তবায়নের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করুন।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতি

তনয় দেওয়ান

সাধারণতঃ মানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যে সকল অধিকার প্রয়োজন তাই মানবাধিকার। এই মানবাধিকার মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্ম ও নিয়োগ, সামাজিক নিরাপত্তা ও সেবা, সুষ্ঠু পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস লালন-পালন, চলাচল, ভূমি প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় অধিকারকে বুঝায়। কিন্তু তারপরও মানবাধিকার বিষয়টির ব্যাখ্যা অস্পষ্ট থেকে যায়। তবে এটির প্রকৃতি রাজনৈতিক এবং এর বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর সামষ্টিক নাম হলো মানবাধিকার। মানবাধিকার বিষয়টি দুটো মৌলিক অধিকার নির্দেশ করে। প্রথমতঃ সহজাত ও অলঙ্ঘনীয় অধিকারসমূহ। দ্বিতীয়তঃ মানুষের আইনগত অধিকারসমূহ। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো আইনানুগভাবে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা। ব্যক্তির অধিকার চর্চা যেন অন্যের অধিকার খর্ব না করে তার দেখাশুনা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যেমনিভাবে একজন ব্যক্তি তার হাত চালনা ততদুর পর্যন্ত করতে পারে না যেখানে অপরজনকে আঘাত করে। তাই একজনের অধিকার হলো অপরজনের দায়িত্বের মতো। প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সে পরবর্তীতে বিভিন্ন বিধি-নিষেধের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। তাই একজন ব্যক্তি অপরাধ করলেও তা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার ব্যক্তি অধিকার ভোগ করার অধিকারী। এক্ষেত্রে অপরাধ হলো ব্যক্তি মানুষের এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন হলো রাষ্ট্রের। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে তখন সেটি তার অপরাধ এবং রাষ্ট্র যখন তার সংস্থা (পুলিশ, নিরাপত্তাবাহিনী এবং অন্যান্য) দ্বারা ব্যক্তির স্বীকৃত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকার খর্ব করে তখন সেটা হলো মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাছাড়া ব্যক্তির অধিকার খর্ব হওয়া তথা ব্যক্তি কর্তৃক কৃত অপরাধ রোধে ব্যর্থ হলেও তা সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে সম্প্রতি বিবেচিত হচ্ছে। মানবাধিকারের ধারণা প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে। বস্তুতঃ মানবাধিকার বিষয়টি রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইহার বাস্তবায়ন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গণ সচেতনতা। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। রাষ্ট্রই হলো মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রধান রক্ষক ও জামিনদার। কিন্তু এক রাষ্ট্রের মানবাধিকার রক্ষায় আরেক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। অথচ মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। এই অধিকার সংরক্ষণের জন্য দরকার আন্তর্জাতিক প্রয়াস। তাই মানবিক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ বিষয়টিও এখন যেমন একটি মানবাধিকার তেমনি উন্নয়ন সুযোগও একটি মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া যৌতুক, ফতোয়াবাজি, শিল্প কারখানায় অগ্নিকান্ডে মৃত্যু, এসিড নিক্ষেপ, শিশু ও নারী নির্যাতন ও পাচার ইত্যাদিও মানবাধিকার লঙ্ঘনের আওতায় বিবেচিত হচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লক্ষ্যণীয় যে, বিজিত রাষ্ট্র বা জাতিগুলো চরমভাবে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিজিত রাষ্ট্র বা জাতির উপর শোষণ নিপীড়নের মাত্রা চরম আকার লাভ করে। তাদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব হওয়ার সাথে সাথে জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় মুছে দেয়ার রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র তাদের জীবনে কালো থাবার মতো আঘাত করে। দাসত্ব আর শোষণই তাদের নিয়তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বব্যাপী চরম ক্ষোভ ও সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জাতীয়তার প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। জাতীয়তাবাদের ঢেউ সমগ্র মানব জাতিকে দোলা দেয়। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে উপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বিকশিত হতে থাকে। পরিণতিতে একদিকে মানুষের অধিকার চরম বিপর্যয় ও জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের আগ্রাসনে বিশ্ব ব্যবস্থা চরম অশান্তির মুখে পতিত হয়। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। এই যুদ্ধে মানবতার চরম বিপর্যয় পশুত্বকেও হার মানিয়েছিল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর বিশ্বের শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নতুন চিন্তা দুনিয়ার তাবৎ মানুষকে ভাবিয়ে তুলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপর নির্ভর না করে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেয়ার জন্য বিশ্ব জনমত গড়ে উঠতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিজিত ও অধিকৃত অঞ্চলে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই নির্মম অভিজ্ঞতা থেকে আন্তর্জাতিক প্রয়াসের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য হয়ে উঠে। তারই অংশ হিসেবে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় এবং উক্ত কমিশনের উপর মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিল (International Bill of Human Rights) উত্থাপনের ভার দেয়া হয়। এক পর্যায়ে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ৩০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ গ্রহণ করা হয়। এই মানবাধিকার বিলটির ঘোষণায় বলা হয় যে, এটি হচ্ছে বিশ্বের সকল মানুষের ও সকল জাতির Common Standard of Achievment। সেদিন থেকে জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ ১০ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এই সনদের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে ন্যুনতম আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করা। এই সনদকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক আদালতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আদালতে এবং সরকারসমূহ কর্তৃক প্রায়ই এই সনদকে মানুষের মৌলিক অধিকারের ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়া হয়। তাই এই সনদকে আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইন হিসেবেও গণ্য করা হয়ে থাকে।

উক্ত সার্বজনীন মানবাধিকার সনদে মূলতঃ দুই ধরনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। একধরনের অধিকার হচ্ছে মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার। সনদের ৩নং অনুচ্ছেদ থেকে ২১নং অনুচ্ছেদগুলোতে এই অধিকারগুলো স্বীকৃত হয়েছে। আরেক ধরনের অধিকার হচ্ছে মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। সনদের ২২নং অনুচ্ছেদ থেকে ২৮নং অনুচ্ছেদগুলোতে এই অধিকারগুলো বিধৃত হয়েছে। সার্বজনীন মানবাধিকার সনদে বলা হয়েছে যে, মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যের আত্মমর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য সম অধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে

বিশ্বের স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও শান্তির মূল ভিত্তি। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সাধারণ পরিষদ এই ঘোষণাকে সকল মানুষ ও জাতির জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের প্রতিটি অংশকে এই অধিকার ও স্বাধীনতার মর্যাদা বিধান এবং এগুলোর সার্বজনীন স্বীকৃতি ও প্রয়োগ করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হতে হবে বলে ঘোষণা করেছে। অপরদিকে যাতে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় সেজন্য নাগরিকদের অবশ্যই সর্বদা সজাগ থাকতে হবে এবং সরকারকে এ ব্যাপারে তাগিদ দিতে হবে।

সার্বজনীন মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহই হচ্ছে মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনের প্রাথমিক ভিত্তি ও উৎস। সার্বজনীন মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত অধিকারগুলোর আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানে ও জাতীয় আইনগুলোতে মানবাধিকার বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে। উপরন্তু সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্ন চুক্তিও সম্পাদিত হয়ে থাকে। উক্ত সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের উপর ভিত্তি করে জাতিসংঘ, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন ও জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর মাধ্যমে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন কোভনেন্ট ও কনভেনশন ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ হচ্ছে নীতিগত মানদন্ড। এই সনদ জাতিসংঘ সদস্যভূক্ত রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদানের যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি এই সনদ বাস্তবায়নেও রাষ্ট্র বাধ্য নয়। পক্ষান্তরে দেশের সংবিধান বা আইন বা কোন চুক্তিতে স্বীকৃত অধিকারগুলো বাস্তবায়নে রাষ্ট্র বাধ্য। অপরদিকে জাতিসংঘ, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন ও জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলো কর্তৃক গৃহীত কোন কোভনেন্ট বা কনভেনশনে কোন রাষ্ট্র স্বীকৃতি (Ratification), অনুসমর্থন (Accession), স্বাক্ষর (Signature) করলে সেই রাষ্ট্র নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই কোভনেন্ট বা কনভেনশনের আলোকে দেশের জাতীয় আইনগুলো সংশোধন এবং প্রতিপালন করতে বাধ্য। উল্লেখ্য যে, কোভনেন্ট বা কনভেনশনের পুরো দলিলে যেমন অনুস্বাক্ষর করা যায়, তেমনি আপত্তিজনক অনুচ্ছেদগুলো বাদ দিয়েও অবশিষ্ট অনুচ্ছেদগুলোর উপরও সমর্থন করা হয়।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ

১. মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান।
২. জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা-ধর্ম, মতবাদ, জাতীয় ও সামাজিক অবস্থান, জন্ম, সম্পত্তি ইত্যাদি বৈষম্য নির্বিশেষে প্রত্যেকে ঘোষিত সকল স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করবে।
৩. ব্যক্তির জীবন যাপন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার।
৪. দাসত্ব থেকে মুক্তি।
৫. নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি।
৬. আইনের চক্ষে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি।
৭. আইনের চক্ষে সমান ও সমমর্যাদা।
৮. মৌলিক অধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর আইনগত প্রতিকার।
৯. জবরদস্তিমূলক গ্রেপ্তার, আটক ও নির্বাসন থেকে মুক্তি।
১০. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালে ন্যায় বিচার ও প্রকাশ্য শুনানি।
১১. দোষী সাব্যস্থ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপরাধ হিসেবে বিবেচিত।
১২. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বাসগৃহ বা চিঠিপত্র আদান প্রদানে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি।
১৩. চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা।
১৪. আশ্রয় লাভের অধিকার।
১৫. জাতিসত্বার স্বীকৃতি।
১৬. বিবাহ ও পরিবার গঠন।
১৭. সম্পত্তির মালিকানা।
১৮. চিন্তা, বিবেক ও ধর্মাচারণের স্বাধীনতা।
১৯. মতামত প্রকাশ ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা।
২০. শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা।
২১. সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ ও সরকারী চাকুরীতে সমানাধিকার।
২২. সামাজিক নিরাপত্তা।
২৩. কাজ কর্ম এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদান।
২৪. বিশ্রাম ও বিনোদন।
২৫. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও সামাজিক সেবা পাওয়ার অধিকার।
২৬. শিক্ষার অধিকার।
২৭. সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।
২৮. প্রত্যেক ব্যক্তি এমন এক সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে বসবাসের অধিকারী সেখানে ঐ ঘোষণায় উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণরূপে কার্যকর করা।
২৯. ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সমাজের সামাজিক কল্যাণে আইন ও নীতিমালা মেনে চলা।
৩০. এই ঘোষণায় লিপিবদ্ধ অধিকার ও স্বাধীনতা লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল ও ব্যক্তি এই ঘোষণার কোন অনুচ্ছেদ ব্যবহার বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

জাতিসংঘ ও মানবাধিকার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং অধিকতর নিরাপত্তামূলক ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা। জাতিসংঘের ইশতেহারের (The Charter of the United Nations) ১(৩)নং অনুচ্ছেদে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহে বলা হয়েছে যে - 'বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা এবং ধর্ম নির্বিশেষে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে উন্নতিবিধান এবং উৎসাহ সাধন এবং উৎসাহদানের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।' জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সংস্থা সাধারণ পরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে বৈষম্যহীন মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। এলক্ষ্যে সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘোষণাপত্র ও কনভেনশন গ্রহণ করে আসছে। ১৫ সদস্য নিয়ে (স্থায়ী ৫ এবং অস্থায়ী ১০) গঠিত জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদেরও প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। বস্তুতঃ মানবাধিকার বিষয়টির দেখাশুনার মূল দায়িত্ব হচ্ছে ৫৬ সদস্য নিয়ে গঠিত জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের। এলক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ 'মানবাধিকার কমিশন' (Commission on Human Rights) নামে ৫৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি রাজনৈতিক সংস্থাও গঠন করেছে। এই কমিশনই মানবাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি প্রত্যক্ষভাবে দেখাশুনা করে। এই কমিশন বিভিন্ন

চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও গবেষণাকর্মের মাধ্যমে মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করে। এছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করাও এই কমিশনের অন্যতম কাজ। এছাড়া এই কমিশনকে সহযোগিতা করার জন্য নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই কমিশনের অধীনে ২৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ বিষয়ক সাব-কমিশন (Sub-commission on Promotion and Protection of Human Rights) গঠন করা হয়েছে।

আরো রয়েছে আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Courts of Justice) নামে একটি প্রধান আইনী সংস্থা। এটা জাতিসংঘের স্বীকৃত বিভিন্ন ঘোষণাপত্র ও আইনের ব্যাখ্যা করে থাকে। এই আদালতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। এছাড়া ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার কমিশনের জন্য একজন হাই কমিশনারও নিয়োগ করা হয়। এই হাই কমিশনার সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস-এর প্রধান। এই সেন্টারটি জাতিসংঘ সচিবালয়ের একটি অংশ। উপরন্তু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থাও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রযোজ্য কোভনেন্ট ও কনভেনশনগুলো

কোভনেন্ট বা কনভেনশন (Covenant & Conventation)	কার্যকারিতার জন্য উন্মুক্ত	বাংলাদেশে কার্যকারিতার তারিখ
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)	৩ জানুয়ারী ১৯৭৬	৫ জানুয়ারী ১৯৯৯
নাগরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Civil and Political Rights)	২৩ মার্চ ১৯৭৬	৬ ডিসেম্বর ২০০০
আদিবাসী ও উপজাতীয় বিষয়ক কনভেনশন (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন নং ১০৭)। (এটি ১৯৮৯ সালের ১৬৯নং কনভেনশনে সংশোধন করা হয়।)	২ জুন ১৯৫৯	২২ জুন ১৯৭২
বর্ণ-বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক কনভেনশন (Convention on the Elimination of Racial Discrimination)	৪ জানুয়ারী ১৯৬৯	১১ জুলাই ১৯৭৯
নারীর প্রতি বৈষম্য দুরীকরণ কনভেনশন (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women)	৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১	৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪
শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention on the Rights of the Child)	২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০	২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০
Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment।	২৬ জুন ১৯৮৭	৪ নভেম্বর ১৯৯৮
জীব বৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশন (Convention on Biological Diversity)।		
বন বিষয়ক আন্তঃসরকারী প্যানেল (Inter-Government Panel on Forests)		
স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনের এজেন্ডা ২১ (Agenda 21 of the Commission on Sustainable Development)। গৃহীত ও কার্যকারিতা লাভ।		

মানবাধিকার ও আদিবাসী জনগণ

মানবাধিকারের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে আদিবাসী জনগণের অধিকার। আদিবাসী জনগণের অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে জাতিসংঘের কার্যক্রমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারের উপর সবিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। জাতিরাষ্ট্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতিগুলি বিপন্নতার দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হওয়ায় জাতিসংঘ এই বিশেষ অধিকারের কথা তুলে ধরেছে। এলক্ষ্যে ১৯৭০ সালে জাতিসংঘের বৈষম্য প্রতিরোধ ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা বিষয়ক কমিশনের (Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) (বর্তমানে এই সাব-কমিশনের নাম হয়েছে মানবাধিকার কমিশন) উদ্যোগে Mr. Jose R. Martinez Cobo-এর মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর বৈষম্য নীতির উপর ১২ বছর ধরে গবেষণা করা হয়। উক্ত গবেষণা কর্মের সুপারিশমূলে ১৯৮২ সালে আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ বিষয়ক সাব-কমিশনের অধীনে ৫ সদস্য বিশিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ স্থাপন করা হয়। এই ওয়ার্কিং গ্রুপের কাজ প্রধানতঃ দু'টি - (১) জাতীয় পর্যায়ে আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত অগ্রগতির পর্যালোচনা করা এবং (২) বিশ্বব্যাপী আদিবাসী জনগণের অবস্থা ও আকাঙ্খা সম্পর্কিত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ (Standard-setting) করা। এছাড়া উক্ত গবেষণা কর্মের সুপারিশমূলে ১৯৮৫ সাল থেকে আদিবাসী অধিকার বিষয়ক একটি ঘোষণাপত্র প্রণয়নের কাজ শুরু হয় এবং এই ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ১৯৯৩ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের নিকট পেশ করা হয়। এই খসড়া ঘোষণাপত্র চূড়ান্তকরণার্থে বিবেচনার জন্য ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ বিষয়ক সাব-কমিশনের অধীনে ৫ সদস্য বিশিষ্ট আদিবাসী অধিকার সনদ প্রনয়ণ সংক্রান্ত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। এই ঘোষণাপত্র এখনও চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়নি। এই ঘোষণাপত্রে ১৯টি মুখবন্ধ ও ৪৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এই ঘোষণাপত্রে আদিবাসীদের 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার' প্রদানের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি ১৯৯৮ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সম্পূরক সংস্থা হিসেবে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট (সম সংখ্যক সরকারী ও আদিবাসী প্রতিনিধি নিয়ে) আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহও আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ শ্রমজীবি মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯১৯ সালে গঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে (আইএলও) ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ ব্যবস্থার একটি অংশে পরিণত করা

হয়। এই সংস্থাটি শ্রম, শ্রমিক এবং আদিবাসী ও উপজাতি জনগণের অধিকারের জন্য কাজ করে। ১৯৫৭ সালে ২৬ জুন তারিখে আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী কনভেনশন (কনভেনশন নং ১০৭) গৃহীত হয়। কনভেনশনে ৮টি অংশে ২৯টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। কনভেনশন কাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত আদিবাসীদের জন্য বিশেষ বিধান, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একীভূতকরণ, একীভূতকরণের শর্তাবলী, সার্বিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ, আদিবাসীদের অধিকার ও কর্তব্য, আদিবাসীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেশের আইন ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর রোধের ব্যবস্থা, কালো আইন বা নিবর্তনমুলক আইনের প্রয়োগ হতে তাদের অব্যাহতি প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে ১ম অংশে ১০টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। ২য় অংশে ভূমি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। উক্ত কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১১-তে বলা হয়েছে - "সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত জমির উপর যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে।" ৩য় অংশে চাকুরীতে নিয়োগ ও শর্তাবলী, ৪র্থ অংশে বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প ও গ্রামীণ শিল্প বিষয়ে বলা হয়েছে। ৫ম অংশে সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, ৬ষ্ট অনুচ্ছেদে শিক্ষা ও আদান-প্রদানের উপায় এবং ৭ম অংশে প্রশাসন বিষয়ে বিবৃত হয়েছে। এই অংশে ২৭ অনুচ্ছেদের (১) এ বলা হয়েছে - "এই কনভেনশনের আওতাভূক্ত বিষয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য এজেন্সী সৃষ্টি কিংবা উন্নয়ন করবে।" পরিশেষে ৮ম অংশে সাধারণ শর্তাবলী উল্লেখিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এই কনভেনশনে স্বাক্ষর প্রদান করলেও আদিবাসী এই দেশে যে রয়েছে তা স্বীকার করেনি। এই অস্বীকৃতির কারণে আইএলও প্রণীত কনভেনশনের স্বীকৃত অধিকার লাভে জুম্ম জনগণ অদ্যাবধি বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার। আদিবাসীদের অস্বীকৃতি শুধুমাত্র সরকারের উগ্র একক বাঙালি জাতি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিফলিত করেনি, রাষ্ট্র চরিত্রটাকে সাম্প্রদায়িকও করেছে। এই রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িক চরিত্র জাতিগত সন্ত্রাস সৃষ্টিতে উস্কানি দিয়ে আদিবাসীদের অস্তিত্বকে চরম বিপন্ন করেছে।

বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘন

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত দেশ হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার ও দেশের প্রণীত সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বাস্তবায়ন এবং প্রতিপালনে বাধ্য। এখানে মানবাধিকার কমিশনে যারা প্রতিনিধি হিসেবে থাকেন তারা সবাই সরকারের কর্মকর্তা। তারা জাতিসংঘে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার জন্যই কাজ করে। এই কাজ করতে গিয়ে তারা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলোকে ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা চালায়। তাই এটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত (Ratified) আন্তর্জাতিক চুক্তি (কোভনেন্ট) বা কনভেনশনগুলো সরকার প্রতিপালন করছে না। যে সকল কনভেনশন ও কোভনেন্ট-এ বাংলাদেশ স্বীকৃতি দিয়েছে তদনুসারে দেশের আইনগুলো সংশোধন করা হয়নি এবং এ সকল কনভেনশন ও কোভনেন্টগুলো বাস্তবায়নের কার্যকর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়নি। এখনো দেশের আদালতসমূহে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদত্ত কনভেনশন ও কোভনেন্টগুলো গ্রহণযোগ্য নয় কিংবা আইন-আদালতে এসব কনভেনশন ও কোভনেন্টগুলো প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ। সম্প্রতি বর্তমান জোট সরকার একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। কিন্তু উক্ত মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার ও স্বাধীনতা নিয়ে গোড়াতেই প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েছে। বিশেষ করে সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগসমূহ এই মানবাধিকার কমিশনের তদন্তের আওতাধীন হবে না আইনে লিপিবদ্ধ করায় এর বিরুদ্ধে সচেতন মহলে উদ্বেগ ও সংশয় দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয় এতে বাংলাদেশের আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিও স্থান পাচ্ছে না। তাই এই কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান মানবাধিকার লংঘন রোধে যে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অনেকে মানবাধিকারের প্রথম ভিত্তি বলে মনে করেন। এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিনিয়ত খর্ব হওয়ায় বিশেষ করে সরকার বিরোধী যে কোন বক্তব্যকে রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে মানবাধিকার লংঘন করার প্রবণতা সরকারসমূহের মধ্যে বিদ্যমান। এভাবে বাংলাদেশে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্ষমতাসীন সরকার মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদেরকে পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে এমনকি নিজ দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে চরমভাবে নির্যাতন করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা আইন মানবাধিকার এর পক্ষে সবচেয়ে বড় আইনগত হুমকী। এছাড়া ফৌজাদারী আইনের ৫৪ ধারাও পুলিশ কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের এক মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে সামরিক শাসকরা সামরিক শাসন জারী করে মানবাধিকার লংঘন করেছে। সরকার মানবাধিকার লংঘনের ধারা অব্যাহত রেখেছে এবং অন্যের দ্বারা মানবাধিকার লংঘনে প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া বিগত সময়ে সামরিক শাসন, উপদ্রুত এলাকা, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে মানবাধিকার লংঘন করা হয়েছে। বাংলাদেশের একটি অন্যতম মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটিশন সেন্টার ফর ট্রমা ভিক্টিমস (বিআরসিটি) এর তথ্য ও গবেষণা বিভাগ এর তথ্য অনুযায়ী সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দ্বারা ২০০২ সালের জানুয়ারী মাস হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৮৯ জন ব্যক্তি নিহত হন। আইন প্রয়োগকারী ও নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা ১০২৬ জন আহত হন বলে জানা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতি

রাষ্ট্রই হলো মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রধান রক্ষক ও জামিনদার। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চরিত্র হলো ভক্ষকের ভূমিকা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণপরিষদে দেশের জন্য প্রথম সংবিধান প্রণয়নকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি সাংবিধানিকভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। তাই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কালই হলো জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘনের সূচনা কাল। ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতি সংবিধানে জাতীয় পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ সরকার কর্তৃক তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। সংবিধানে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার পর এই লংঘন প্রক্রিয়া আরও জোরদার হয়। অমুসলিম জুম্ম জাতি জাতীয় পরিচয়ের পাশাপাশি ধর্মীয়ভাবেও তার অধিকার হতে বিপন্ন হয়ে পড়ে। গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়

পরিণত করার জন্য ইসলামী সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করা হয়। আরব দেশসমূহের মৌলবাদী শাসকগোষ্ঠী এই নীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের মৌলবাদী রাজনৈতিক দল, কতিপয় জাতীয় এনজিওদেরকে সকল প্রকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এই কার্যক্রম দ্রুত ও জোরালো করে তুলে। তাই নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। এই মানবাধিকার লংঘন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও আইন নির্ভর নয় এটি বরং সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে জুম্ম জাতিকে বিকৃতভাবে পাঠ্য পুস্তকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চরম আগ্রাসন চালানো হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত 'তাজিংদং' নাম বিলুপ্ত করে আদিবাসীদের সাথে কোনরূপ আলোচনা বা সম্মতি ব্যতিরেকে 'বিজয়' নামকরণ করা হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অধিকার হতে জুম্মরা বঞ্চিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়টি হস্তান্তরের কথা থাকলেও সরকার অদ্যাবধি তা বাস্তবায়ন করেনি। তাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দিলেও অন্যান্য আদিবাসী জাতিদের ভাষার বিকাশ ও সংরক্ষণের কোন স্বীকৃতি বা পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেনি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতি চরম বিপর্যস্ত এবং জুম্মদের মানবাধিকার প্রতিনিয়ত লংঘিত।

চুক্তিত্তোর সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা থেমে থাকেনি। স্বাভাবিকভাবে জুম্ম জনগণ আশা করেছিল তাদের মানবাধিকার চুক্তিত্তোর সময়ে অগ্রগতি সাধিত হবে। ন্যুনতম মানবাধিকার চুক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু চুক্তিত্তোর সময়েও মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। 'অপারেশন উত্তরণ' হলো মানবাধিকার লংঘনের অন্যতম প্রক্রিয়া। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্পগুলো জুম্মদের স্বাভাবিক চলাচল, অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও নিরাপত্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। সে ছাড়াও সরকারের পোষ্যপুত্র সেটেলার বাঙালিরা মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। তার পাশাপাশি সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী চক্র মানবাধিকার লংঘনের অন্যতম হোতা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে চুক্তিত্তোর সময়ে তারা প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা অপহরণ, খুন, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জুম্মদের স্বাভাবিক জীবনকে দুর্বিষহ করেছে। প্রতিনিয়ত পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে সরকারের এজেন্ট, দোসর ও অনুপ্রবেশকারী সেটেলারদের দ্বারা জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে। একটু পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ জুম্মদের ভূমি বেদখল করার জন্য গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ চালিয়েছিল। তারপর দেশে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণের ফলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয় জুম্ম জনগণ। এই নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং জুম্ম জনগণের ভূমি বেদখল করা। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন জারী করে। বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলেও কোন সরকারই এই সামরিক শাসনের নীতি হতে সরে আসেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করাও একটি অন্যতম মানবাধিকার লংঘন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করছে এই অঞ্চলের সার্বিক অবস্থা। চুক্তিতে স্বীকৃত পার্বত্য অঞ্চলের স্বকীয়তা, স্থায়ী বাসিন্দাদের অধিকার, স্বশাসন ব্যবস্থা, পুনর্বাসন প্রভৃতি দিক চরমভাবে লংঘন করে সরকার নতুন সংকট সৃষ্টি করছে। এই সংকট যেমনি পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত করছে তেমনিভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সকল সম্ভাবনাকে গুড়িয়ে দিচ্ছে। যে কারণে দেখা গেছে সরকারের সাধারণ প্রশাসন (জেলা থেকে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ), পুলিশ প্রশাসন চুক্তিকে উপেক্ষা করছে, সংসদে প্রণীত আইনকে অস্বীকার করছে। চুক্তিকে অকার্যকর রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে। শুধু তাই নয় সরকারের বন বিভাগ দ্বারা বনায়নের নামে যেভাবে ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ কার্যক্রম চলছে তাতে মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে সর্বত্র। সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিকে এভাবে গুদামজাত করার প্রক্রিয়া মানবাধিকার লংঘনেরই নামান্তর।

চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার লক্ষ্যে সমতল জেলাসমূহ হতে সেটেলারদের অনুপ্রবেশ জোরদার হয়েছে। তারা ধীরে ধীরে ভূমি বেদখল করার প্রচেষ্টায় জড়িত। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির উপর চাপ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চাপ ঠেকানোর ক্ষেত্রেও সরকারের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বরং ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু না করে ভূমি অধিগ্রহণ ও বেদখল করে জুম্মদেরকে ভিটেমাটি ছাড়া করা হচ্ছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ও মানবাধিকার লংঘন সুস্পষ্ট। বিদেশী উন্নয়ন সংস্থারা যাতে কোন অনুকুল উন্নয়ন কাজ করতে না পারে তজ্জন্যে প্রতিকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশে বর্তমানে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পন্ন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। তারা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ ক্ষুদ্র জুম্ম জাতিদের স্বীকৃতি দিতে পারে তেমনিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক শাসন 'অপারেশন উত্তরণ' প্রত্যাহার করে মানবাধিকার লংঘনের ধারা রোধ করতে পারে। জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বকীয় শাসনব্যবস্থাকে স্বীকার করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি রচিত হবে। অন্যথায় সামরিক শাসন জারী রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মোচিত হতে পারে না।

তথ্য সূত্র ঃ

১. জুম্ম জনগণের উপব মানবাধিকার লংঘন - শ্রী জগদীশ, ১০ ই নভেম্বর স্মরণে, বুলেটিন নং-১৮, ১০ ই নভেম্বর ১৯৯৪।

২. সম্পাদকীয়, দৈনিক পূর্বকোণ, ১০ ডিসেম্বর ২০০২।

৩. মানবাধিকার লংঘন কখনোই সরকারের জন্য সুফল বয়ে আনে না - আইন ও সালিশ কেন্দ্র, প্রথম আলো, ১০ ডিসেম্বর ২০০২।

৪. বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি - আকরাম হোসেন চৌধুরী, আজকের কাগজ, ১০ডিসেম্বর ২০০২।

৫. রাষ্ট্রসংঘ - শেখর দত্ত।

৬. জাতিসংঘের ওয়েব সাইট <www.unhchr.ch>।

৭. তৃণমূল নিউজলেটার, ৯ আগষ্ট ২০০১, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সংখ্যা, তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থার প্রকাশনা।

৮. বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ ও বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রে তাদের অবস্থান - মঙ্গল কুমার চাকমা, সংহতি ২০০১।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং সাম্প্রতিক একটি অপহরণ ঘটনা

সজীব চাকমা

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা

সাম্প্রদায়িকতা! 'সম্প্রদায়' থেকেই সাম্প্রদায়িকতা। অভিধানে এর অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে প্রথমতঃ দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিষয়বস্তু, দ্বিতীয়তঃ সম্প্রদায়গত ভেদ বুদ্ধি। প্রথমটা নিরীহ, নির্বিরোধ এবং ভদ্র প্রতিবেশীসুলভ। কিন্তু দ্বিতীয়টি বৈষম্যমুলক, বিদ্বেষপূর্ণ, সংকীর্ণ, অহংকারী, উগ্র এবং আক্রমণাত্বক। প্রথম অর্থটা এখন সচল নয়, চলছে দ্বিতীয়টিরই রাজত্ব। প্রায়োগিক দিক থেকে দ্বিতীয়টা আরও মারাত্মক। সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবার বিভিন্ন মাত্রা - সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সাম্প্রদায়িক উস্কানী, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংঘর্ষ ইত্যাদি। অপরদিকে সাম্প্রদায়িকতার রূপের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণগত সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, ভৌগোলিক সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতা পৃথিবীর অনেক দেশে বিশেষতঃ এই উপমহাদেশে দীর্ঘদিন থেকে এখনও অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও গ্লানিকর সামাজিক একটি ব্যাধি। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণে মানুষ শিকার হয় বৈষম্যের, নির্যাতন-নিপীড়নের। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণে মানুষ চলে যেতে পারে একেবারে মধ্যযুগে, বর্বরযুগে। নেমে যেতে পারে অনেক নীচে একবারে পশুর পর্যায়ে। মানুষ তখন আর মানুষ থাকতে পারে না, হারিয়ে ফেলে বিবেকবুদ্ধি, মানবিক মূল্যবোধ, ভুলে যায় সবার উপরে মানুষ সত্য। মানুষ আঘাত করে তখন মানুষকেই, মানুষই কেড়ে নেয় মানুষের মৌলিক অধিকার। ভূলুণ্ঠিত হয় মানবতা।

অন্য অনেক প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানের মত সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তিও মূলতঃ স্বার্থের ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বা রাষ্ট্রে শোষক অধিপতি শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে, নীতি-কৌশলরূপে। অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার দে-এর ভাষায়, 'মানব সমাজের আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ব্যবস্থা তাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে। ফলতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে থাকে। অবশ্য দলনেতার আধিপত্য সর্বক্ষেত্রে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত ছিল। প্রতিটি দলের আপন বৈশিষ্ট্য এবং আধিপত্যকে অন্য দলের উপর বিস্তৃত করে সম্পদ আহরণ এবং দলের প্রভাব বলয় বৃদ্ধি ছিল মূল লক্ষ্য। মূলতঃ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এখানেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ নিহিত রয়েছে।' আবার 'সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার মূলে কিন্তু ক্রিয়াশীল হলো মানুষের স্বার্থপরতা। এরূপ সাম্প্রদায়িকতার একমাত্র কামনা হলো বিভিন্নরূপে অপরের সম্পদ কুক্ষিগত করা।' অর্থাৎ দলগত, জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত বা ধর্মগত ইত্যাদি স্বার্থই হল সাম্প্রদায়িকতার মূল ভিত্তি।

একসময় আমরা দেখি আফ্রিকা বা পাশ্চাত্যে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থপ্রসূত সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ যেমনি বর্ণবাদভিত্তিক, যা শাসক সাদারা চাপিয়ে দেয় কালোদের (নিগ্রো) উপর, আর বাংলাদেশ তথা সমগ্র উপমহাদেশে তা আমরা দেখি মূলতঃ ধর্মকে বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে,'ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যে সংকট সে তো বেশ পুরাতন এবং এখনো জীবন্ত। সাম্প্রদায়িকতা, আসলে ক্ষমতার লড়াই। ধর্ম অজুহাত মাত্র; অস্ত্রও বটে। মূল প্রশ্নটা ক্ষমতার ভাগাভাগির।' তিনি আরও বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা কেবল ধর্মীয় নয়, অন্য প্রকারেরও হতে পারে; কিন্তু কোন সাম্প্রদায়িকতাই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মতো প্রবল নয়।' বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের রাজনীতি ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা সেখানে দেখতে পায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এখানে কত গভীর, ব্যাপক। এখানে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপকতা ও গভীরতা পায় মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের এখানে আগমন ও শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর থেকেই। এখানে এসেই তারা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত বিশাল জনগোষ্ঠীকে শাসন শোষণ ও দুর্বল করার জন্য অবলম্বন করে বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, জাতি তথা সম্প্রদায় ভিত্তিক 'ভাগ করো শাসন করো নীতি।' এজন্য এক সময় এখানে ঘটে কত দাঙ্গা, ষড়যন্ত্র, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, কত নির্যাতন, নিপীড়ন। এক পর্যায়ে সৃষ্টি হয় ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান তথা দ্বিজাতি তত্ত্ব। বৃটিশরা এটা প্রয়োগ করে অত্যন্ত সুচতুরভাবে তৎকালীন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতাকামী আন্দোলনকারী ভারতের নাগরিকদের বিভাজন করে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উপমহাদেশের ইতিহাস ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলেরও অন্তর্ভূক্ত। তাই উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রভাবমুক্ত নয় পার্বত্য চট্টগ্রামও। আবার পাকিস্তান শাসনমুক্ত হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ভাগ্য অনেকটা জড়িয়ে যায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাথে। এই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখি - ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলেও স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ হারাতে বসে তার অসাম্প্রদায়িক চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অনিবার্যভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। যে কারণে এখানেও প্রতিনিয়ত ঘটতে দেখি সংখ্যালঘু নির্যাতন, জাতিগত নিপীড়ন, সাম্প্রদায়িক উস্কানী, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, খুন, হানাহানি, বৈষম্য ইত্যাদি নানাবিধ প্রতিক্রিয়াশীলতা। স্থান ও কাল ভেদে এই প্রতিক্রিয়াশীলতার মাত্রায় তারতম্য ঘটলেও প্রকৃতপক্ষে এটা বাংলাদেশের একটি চরম বাস্তবতা।

বাংলাদেশে এই সাম্প্রদায়িকতা আসে ধর্মীয় পক্ষপাত, ধর্মান্ধতা ও জাত্যাভিমান থেকে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রগতিশীল হলেও কিন্তু সেই বিজয় বাঙালী জাতিকে বিশেষতঃ বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম ধর্মীয় বাঙালীকে বা তাদের শাসকগোষ্ঠীকে করে অহংকারী, আগ্রাসী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। যে কারণে স্বাধীনতার পরপরই আমরা দেখি নানা সাম্প্রদায়িক আচরণ। তাই ১৯৭২ সালের মাঝামাঝিতেই আমরা দেখি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গবেষক অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে বলছেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে অসঙ্গত ঠেকছে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ সরকারের নির্ভুল সাম্প্রদায়িক আচরণ। ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের সকল ধর্মীয় ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকার কথা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি এবং সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছেন ....'। তবে জিয়াউর রহমানের আমলে সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধান থেকে বিসর্জন দেওয়ার পরপরই তা আরও পাকাপোক্ত হয় বাংলাদেশে। অতপর পার্বত্য চট্টগ্রামও অচিরেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই বৈষম্যমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক চরিত্রের শিকারে পরিণত হয়। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে বিশেষ ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিশেষ বাস্তবতা এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ধর্মের অধিকারী দশ ভাষাভাষি এগারটি আলাদা জাতিসত্তা তথা জুম্মজাতি। বিশেষতঃ এই জুম্ম জাতি যখন চায় তার বিশেষত্বের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, তখন দমন-পীড়নের

অংশ হিসেবে শাসকগোষ্ঠী এখানেও আশ্রয় নেয় সাম্প্রদায়িকতার, ভাগ করো শাসন করো নীতির। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত বিভিন্ন গনহত্যা, সেনা নির্যাতন, পাহাড়ীদের বাড়িঘর জ্বালানো-পোড়ানো, পাহাড়ীদের জমি বেদখল করা, বহিরাগত বাঙালী পূনর্বাসন ইত্যাদি সবকিছুই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র চরিত্রেরই নিদর্শন।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই দেখা যায় তা একটা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপপ্রচেষ্টা থাকে। অপ্রীতিকর ঘটনা বলতে এখানে তাদের কেউ অপহৃত, প্রহৃত, খুন, জখম বা কোন মারামারি বা ঝগড়াঝাটিকে বোঝানো হচ্ছে। সেটা যদি কোন পাহাড়ী বা পাহাড়ী চেহারার কারো কর্তৃক ঘটানো হয় তাতে তো কথায় নেই, অপরিচিত অজ্ঞাতনামা কোন সন্ত্রাসী ঘটালেও তাই। এমনকি কোন না কোন কারণে তাদের সম্প্রদায়ের কেউ ঘটালেও। দেখা গেছে, বাঙালিদের কর্তৃক কোন পাহাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হলেও উল্টো নাটকীয়ভাবে পাহাড়ীকেই আবার দোষী সাব্যস্থ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আবার সংকীর্ণ রাজনৈতিক ও গোষ্ঠী স্বার্থে কৃত্রিমভাবে নাটক করে হলেও নানা উছিলায় পাহাড়ীদেরকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে একটাই দর্শন কাজ করে সেটা হচ্ছে 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' অধিকারকামী পাহাড়িরা বা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত একমাত্র পার্টি জনসংহতি সমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ধরনের লোক, এক ধরনের নেতা-কর্মী বা কিছু গোষ্ঠী সবসময় তৎপর থাকে যাদের কাজই হচ্ছে নিজেদের সংকীর্ণ বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থে প্রতিনিয়ত অধিকারকামী পাহাড়িদের অবদমিত করা; বিভ্রান্ত, বিপর্যস্থ ও ক্ষতি করা। জাতিগতভাবে পাহাড়িদের ধ্বংস করা, উচ্ছেদ করা, তাদের জাতীয় দাসে পরিণত করা। আর এজন্য প্রথম ও প্রধান কাজটি হচ্ছে জুম্মদের অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ক্ষতি করা, পাহাড়ি-বাঙালি সচেতন ও প্রগতিশীল অংশকে বিভ্রান্ত করা। এজন্য তারা কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের কথা বলে (যদিও চুক্তির সুবিধা গ্রহণ করতে ছাড়ে না), কখনো তথাকথিত বাঙালির বা পাহাড়ি-বাঙালির সমানাধিকারের কথা বলে। কখনো শান্তির কথাও বলে। কিন্তু অশান্তি সৃষ্টি করতে, ষড়যন্ত্র করতে, অন্যের অধিকার কেড়ে নিতে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে তারা সদা তৎপর।

আলোচ্য সেই অপহরণ ঘটনা

সম্প্রতি এক অপহরণ ঘটনা ঘটে। অবশ্য কেবল একটা অপহরণ ঘটনা নয়। সেদিন আরও এক অপহরণ ঘটনা ঘটে নানিয়ারচরে। চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নিয়ে যায় প্রহ্লাদ চাকমা নামে এক পাহাড়ীকে। এর পরপর দুইদিন একই উপজেলা থেকে চুক্তিবিরোধীরা নিয়ে যায় আরও দুই জুম্মকে। কিন্তু এই পাহাড়ী অপহরণ ঘটনাগুলি আলোচ্য বিষয় হতে পারেনি। আলোচ্য বিষয় হয়েছে, শুধু আলোচ্য বিষয় নয় আন্দোলন, উস্কানী, উত্তেজনা এমনকি মন্ত্রী, চেয়ারম্যান, নেতা, মুরুব্বীদের সমন্বয়ে সভাও হয়েছে কেবল একটি অপহরণ ঘটনায়। মূলতঃ অপহৃত ব্যক্তিটি একজন বাঙালী বলে এবং এলাকায় প্রভাবশালী বলে।

গত ২৯ অক্টোবর ২০০২ সকাল প্রায় ৯টায় রাঙ্গুনীয়া উপজেলাধীন রাণীরহাট এলাকা হতে সেই বাঙালি অপহরণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং পরে অপহৃত ব্যক্তি মুক্ত হওয়ার পরও বাঙালিদের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাকে পুঁজি করে আবার উক্ত সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উদ্বেগজনক আচরণ, কথাবার্তা ও তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। যা সচেতন, শান্তিকামী ও প্রগতিশীল মানুষকে যথেষ্ট ভাবিত করেছে। উল্লেখ্য, এদিন রাঙামাটি জেলার কাউখালি উপজেলা সংলগ্ন চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়া উপজেলার রাণীরহাট ঠান্ডাছড়ি চা বাগানের ম্যানেজার কাজী নুরুল আনোয়ার জাহাঙ্গীর (৪০) চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হন। অপহরণের পরপরই অপহরণকারীরা মুক্তিপণ হিসেবে দাবী করে দশ লক্ষ টাকা। কোন পত্রিকায় তিন লক্ষ টাকা বলেও উল্লেখ করা হয়। ৯/১০ সদস্যবিশিষ্ট সন্ত্রাসী দলটি পাহাড়ি সন্ত্রাসী বলে অভিযোগ করা হয়। স্থানীয় লোকজনের বরাত দিয়ে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরাই এই অপহরণ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি অপহৃতের মুক্তির ব্যাপারে কলমপতি ইউপি চেয়ারম্যান ক্যউজাই মারমার নেতৃত্বে পাহাড়ি-বাঙালি মুরুব্বীদের সমন্বয়ে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি উদ্ধার কমিটি গঠন করেন। এরই মধ্যে স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। ঢালাওভাবে তারা পাহাড়িদের দোষ দিয়ে হুমকি দিতে থাকে। তারা সড়ক অবরোধ, পাহাড়িদের যাবতীয় কাঁচামাল ক্রয় বন্ধ, পাহাড়িদের অফিস আদালতে প্রবেশ করতে না দেয়া ইত্যাদি একপেশে আক্রোশমুলক হুমকি দিতে থাকে। এ সময় চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কে যাতায়াতকারী পাহাড়ি ছাত্রদেরকে নির্বিচারে হয়রানিও করা হয়। অবশেষে ৫ নভেম্বর ২০০২ উদ্ধার কমিটির তৎপরতায় মুক্তিপণের বিনিময়ে কাউখালী এলাকা হতে মোটামুটি সুস্থ অবস্থায় অপহৃতকে উদ্ধার করা হয়।

অপহরণ ঘটনার জের সাম্প্রদায়িকতা

উদ্ধার কমিটি কর্তৃক অপহৃত ব্যক্তি সুস্থ শরীরে মুক্ত হলেও স্থানীয় বাঙালি নেতারা তাদের তিন দফা (১. এ পর্যন্ত অপহরণে যত মুক্তিপণ নেয়া ও চাঁদাবাজি হয়েছে সে টাকাগুলো ফেরত প্রদান; ২. অপহৃত যারা খুন হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান; ৩. আর যেন খুন, চাঁদাবাজি, অপহরণ ঘটনা না ঘটে সেজন্য পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ কর্তৃক মুচলেকা প্রদান করা) দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনের কথা বলে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমিত না হয়ে বরং আরও বৃদ্ধি পায়। এজন্য তারা 'উপজাতীয় সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি' নামে একটি সংগঠনও সৃষ্টি করে। সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সেনা ও সিভিল প্রশাসন, স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালিদের সমন্বয়ে সৃষ্ট উপজাতীয় সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটির সাথে এক সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এই সভারই সিদ্ধান্তের আলোকে ২৩ নভেম্বর ২০০২ রাঙামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা এমপি সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ঊষাতন তালুকদার, তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্নদলের নেতৃবৃন্দ, কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি। সভায় যথারীতি এসে হাজির হয় অপহরণ ঘটনা সংশ্লিষ্ট এলাকার কয়েকশ বাঙালি।

সভাটি শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতির জন্য দলমত নির্বিশেষে ও প্রশাসনের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে আয়োজিত হলেও প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান ওয়াদুদ ভূইয়া ও খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নক্ষত্র লাল দেববর্মণ এর মত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের যে বালখিল্য বক্তব্য, জেলা পর্যায়ের বিএনপির কতিপয় নেতার যে অসহিষ্ণু ও অশোভন আচরণ ও বক্তব্য এবং রাঙ্গুনীয়া থেকে আগত বাঙালিদের যে আচরণ তা সুশীল সমাজকে যথেষ্ট পীড়িত করেছে। এখানে যার নাম সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য তিনি রাঙ্গামাটি জেলা বিএনপি-র সহ সভাপতি মশিউল আলম হুমায়ুন। সভায় তার অহেতুক অতিরিক্ত উত্তেজনাপূর্ণ, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশালীন আচরণে এবং অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যে চিন্তাশীল পাহাড়ী বাঙালী উপস্থিত অনেককে বিব্রতবোধ করতে ও বিরক্ত হতে দেখা গেছে। এক পর্যায়ে 'সন্ত লারমা'র

নাম উল্লেখ করে এবং সভায় উপস্থিত জনসংহতি সমিতির নেতা ও আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য উষাতন তালুকদারের দিকে আঙ্গুলী নির্দেশ করে এই বিএনপি নেতা বলে যে, 'এই এরাই সন্ত্রাস করছে, চাঁদাবাজী করছে.....'। এমনকি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডঃ মানিক লাল দেওয়ানকেও যিনি খোদ বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটেরই মনোনীত চেয়ারম্যান, তাকেও নিতান্ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাবশে বলে বসেন, 'এই এরা এক ফোটা ঘাম না ঝরিয়েও চেয়ারম্যান হয়ে বসে আছে।' ঘটনার আগামাথা না বুঝে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ হলে কথা নেই কিন্তু একটা সরকার দলের জেলা পর্যায়ের নেতার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ও বক্তব্য মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। তবে এই ঘটনায় এবং সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডঃ মানিক লাল দেওয়ান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কাতেবুর রহমান, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক ডঃ জাফর আহমদ খান, আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য উষাতন তালুকদারসহ পাহাড়ী-বাঙালী অসাম্প্রদায়িক অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা-বক্তব্য অত্যন্ত ইতিবাচক এবং গঠনমূলক।

চা বাগানের ম্যানেজার কাজী নুরুল আনোয়ার জাহাঙ্গীর একজন নিরীহ মানুষ হিসেবে অপহৃত হয়েছেন তা নিশ্চয়ই দুঃখজনক এবং পরে তার মুক্তিও নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক ঘটনা। তাকে যারা অপহরণ করেছে তারা পাহাড়ী হোক বাঙালী হোক, সন্ত্রাসী সন্ত্রাসীই। প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের অপরাধের শাস্তি তাদের প্রাপ্য। কিন্তু অপহরণকারীরা পাহাড়ী অভিযোগে ঢালাওভাবে নির্বিচারে পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়া বা করার কি কোন মানে আছে? দুঃখজনক যে, সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীও বলছেন, 'আরও এক টাকা যদি চাঁদা দিতে হয়, কেউ যদি অপহৃত হয় তাহলে এবার থেকে কাপ্তাই-রাণীরহাট-ফটিকছড়ি এই তিনটি রাস্তায়ই বন্ধ করে দিতে হবে।' এর থেকে আরও একটু অগ্রসর হয়ে ৬ই নভেম্বর ২০০২ দৈনিক গিরিদর্পণের সম্পাদক একেএম মকছুদ আহমেদ তার পত্রিকায় লিখছেন, 'কাউখালী ও ঘাগড়া উপজাতীয় বাসিন্দারা বড় বিপর্যয় থেকে বেঁচে গেল...। ৫ নভেম্বরের পূর্বে রাণীরহাটের ঠান্ডাছড়ি চা বাগানের মালিকের ভাই জাহাঙ্গীরকে ছেড়ে দেয়াতেই এতবড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। যদি ছেড়ে দেয়া না হত তাহলে কাউখালী এবং ঘাগড়ার উপজাতীয়দের সকলকে প্রতিরোধ করা হতো। এমনকি....সড়ক বন্ধ করে দিয়ে রাঙ্গামাটিবাসীকে জিম্মি করে ফেলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল।' এটা কি কোন যুক্তিসঙ্গত কথা হয়? সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ও দৈনিক গিরিদর্পণ সম্পাদক-এর উপরোক্ত বক্তব্য কি সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথা নয়? অপহরণ চাঁদাবাজী করবে সন্ত্রাসীরা তা কেন চাপিয়ে দেয়া হবে সাধারণ নিরীহ পাহাড়ীদের? সাম্প্রদায়িকতার বশবর্তী হয়ে অপহৃত উদ্ধার কমিটিতে কলমপতি ইউপি চেয়ারম্যান ক্যহজাই মারমাসহ পাহাড়ী সদস্য যারা ছিলেন অপহৃত উদ্ধার হওয়ার পরও তাদেরকেও নানাভাবে গালিগালাজ অপমান করা হয়েছে, এমনকি অপহরণ ঘটনার সঙ্গে জড়িত করে তাদের বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া থানায় মামলা দায়ের পর্যন্ত করা হয়েছে।

এখানে আরও একটি দিক উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও রাঙ্গুনিয়া থানার এসআই আমিনুর রশীদ প্রথম আলোতে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, 'অপহরণকারীরা শান্তি চুক্তি বিরোধী। খুন খারাবী, অপহরণ ও চাঁদাবাজী করে চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীরা পাহাড় ও আশেপাশের সমতল এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা নষ্টের চেষ্টা চালাচ্ছে। অপহরণকারীদের সনাক্ত করা গেছে।' অথচ এক্ষেত্রেও দেখা গেছে শুরু থেকে একটা গোষ্ঠী অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যেনতেনভাবে কেবল জনসংহতি সমিতিকে দোষ চাপিয়ে দেয়ার এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপহরণ ঘটনা-সংশ্লিষ্ট এলাকার যারা সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য বিক্ষোভ হতে পারে, আন্দোলন হতে পারে কিন্তু এটাকে পুঁজি করে সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। বিশেষ করে দায়িত্বশীল যারা তারা বিষয়কে বস্তুনিষ্ঠভাবে না দেখে ইতিবাচকভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা না করে যদি নিজেরাই আরও কয়েকগুণ উত্তেজিত, বেপরোয়া হয়ে যান তখন তা হয় অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

দেখা গেছে অপহরণ ঘটনাটি আসলেই কারা ঘটিয়েছে, কিভাবে এই অপহরণ ঘটনা ও সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যায়, কিভাবে পার্বত্যাঞ্চলে সত্যিকারের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা যায় তা বস্তুনিষ্টভাবে অনুসন্ধান ও বিচার না করে তার বদলে একটা গোষ্ঠীর কেবল এই এই যান্ত্রিক ধারণা বা মনোভাই প্রচার করা যে, এই চুক্তি বাতিল করতে হবে, এই চুক্তি শান্তি আনতে পারেনি, নতুন করে সংলাপ শুরু করতে হবে। আর একটি হলো, সব অঘটন ঘটনার পটিয়সী হিসেবে জনসংহতি সমিতি ও তার নেতৃত্বকে দায়ী করা, অভিযোগ করা। অথচ সেই অভিযোগের সমর্থনে কোন তথ্য নেই, তত্ত্বও নেই, ভিত্তিও নেই। অথচ উক্ত অপহরণ ঘটনার জন্য পত্র-পত্রিকায় স্থানীয় লোকজন শুরু থেকে সন্ত্রাসী ইউপিডিএফকে দায়ী করছে, অভিযোগ করছে। অথচ তাদের ব্যাপারে বলতে গেলে টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। এ প্রশ্নও উঠতে পারে আওয়ামী আমলের তিন বিদেশী অপহরণ নাটকের মত এই অপহরণও কোন নাটক নয়তো? চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে পাহাড়ী বাঙালী জনগণের যে আগ্রহী দৃষ্টি সেই দৃষ্টি অন্যখানে সরিয়ে দেয়ার কোন ফন্দি নয়তো?

উপসংহার

এই ঘটনায় প্রধানতঃ যে বিষয়টি উদ্বেগের সাথে পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর তৎপরতা বৃদ্ধি। এই গোষ্ঠীটি সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিতে যেমন সদা তৎপর তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্তর্নিহিত বিষয়টি অনুধাবন না করে কেবল গৎবাধাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের দাবী তুলে শোরগোল, কখনও কখনও গন্ডগোল সৃষ্টি করতেও ইদানীং সদা উদ্গ্রীব হতে দেখা যাচ্ছে। আমরা জানি, দীর্ঘদিনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের হৃত অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে বাংলাদেশ সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে এবং পার্বত্য অঞ্চলকে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করে গত ২ ডিসেম্বর'৯৭ইং সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্যচট্টগ্রাম চুক্তি। যে চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্যচট্টগ্রামে চলা প্রায় দুই যুগের রক্তাক্ত সংঘাত বন্ধ হয়ে সূচিত হয় শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সম্ভাবনা; যে চুক্তির মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা খুঁজে পায় তাদের হৃত অধিকার পূনঃপ্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমরা দেখছি চুক্তি বাস্তবায়নে বাধাঁ হয়ে দাঁড়িয়েছে বা চুক্তিকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে কার্যকরভাবে মূলতঃ সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠী। তারা রয়েছে খোদ সরকারের দলে বা সরকার দলের বাইরে বা সমাজে। তবে কেউ কেউ চুক্তি বিরোধীতা করছে একেবারে কিছু না জেনে স্রেফ সাম্প্রদায়িক উস্কানী বশে আর সশস্ত্র সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ চুক্তি বিরোধীতা করছে একেবারে আক্রোশ বশে সরকারের আভ্যন্তরস্থ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীরই মদদে প্রশ্রয়ে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থান্ধতা বা ষড়যন্ত্র কখনো সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, মানুষকে মহত্ব দিতে পারেনি, সমাজে জাতিতে পথ দেখাতে পারেনি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে, জাতিতে বা শ্রেণীতে বিভক্ত মানব সমাজে বা দেশে পারস্পরিক ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হতে পারে মহত্ব, হতে পারে সমস্যার সমাধান।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল অব্যাহতভাবে চলছে

১. পাল্পউড বা মন্ডোপযোগী নরম কাঠের বাগান

বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত 'পাল্পউড বা মন্ডোপযোগী নরম কাঠের বাগান সৃজন' প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশ পরম্পরায় ভোগদখল করে আসা জমিজমা বেদখল হয়ে যাচ্ছে। রাঙামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলা এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি ও সদর উপজেলার কয়েকটি মৌজায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেয়ায় নতুন করে উচ্ছেদের আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যান ম্যামাচিং মারমা প্রস্তাবিত ৭টি মৌজার ভূমি অধিগ্রহণে অনুমোদন দেয়ায় উচ্ছেদ আতংক আরও জোরালো হয়েছে। অন্যদিকে পাল্পউড ডিভিশনের বিভাগীয় বন কর্মকর্তার (ডিএফও) দেয়া তথ্যেও অসঙ্গতি রয়েছে। তথ্যে পাল্পউড বাগানের জন্য দখলীকৃত ভূমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৪৭,০০৪.৩২ একর। কিন্তু ৬০,০০০ একরের অধিক ভূমিতে প্রকল্পের কাজ চলবে বলে ডিএফও প্রতিনিধিরা জানান।

পাল্পউড বিভাগের ভুমি হস্তান্তর বা অধিগ্রহণের কাজগুলো জেলা প্রশাসক দ্বারা করা হয়েছে। জুম্মদের মালিকানাধীন ও ভোগদখলীয় ভূমিতে এই পাল্পউড বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে। বিগত সময়ে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থাকায় সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ ছিল না। গ্রাম হতে দা, কোদাল, কুড়াল হাতে নিয়ে বের হবার সুযোগ নেই। বন বিভাগের কর্মচারীরা মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। অনেকে পলাতক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। তাদের মুখে হাসি নেই, শান্তি নেই, হতাশায়-নিরাশায় তাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। বন বিভাগ ও স্থানীয় মানুষদের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্যরা তদন্তে গেলে রোয়াংছড়ি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা তাদের কাজে অসহযোগিতা করেন।

রাজস্থলী উপজেলার ৩৩৩নং ঘিলাছড়ি মৌজার হেডম্যান দীপময় তালুকদার জানান যে, তার মৌজার ৮,১৩২.২৩ একর জায়গা পাল্পউড বিভাগ দখল করেছে। তিনি আরও বলেন যে, বিগত অশান্ত পরিস্থিতির সুযোগে বন বিভাগ এই ভূমি বেদখল করেছে। ৩২৯ নং কাপ্তাই মৌজার হেডম্যান বীরেন্দ্র লাল রোয়াজা জানান যে, মৌজায় অনেক ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করে আসছে। যদিও তাদের নামে কোন ভূমি বন্দোবস্তী নেই। তাই নতুন করে পাল্পউড বাগান করার জন্য ভূমি দখল করা হলে এসব পরিবার উচ্ছেদ হবে এবং কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ লাভে বঞ্চিত হবে। তিনি তাঁর মৌজায় যেন নতুন করে পাল্পউড বাগান করা না হয় সেজন্য আহ্বান জানান।

৩৩১নং গাইন্দ্যা মৌজায় ৩৬৮৯.৩৩ একর ভূমি পাল্পউড বিভাগ দখল করে নিয়ে গেছে। পেকুয়া মৌজার হেডম্যান মংমুই অং মারমা জানান যে, তাঁর মৌজার ১৮৩০.৭৯ একর ভূমি পাল্পউড বিভাগ দখল করে নিয়েছে। আরাছড়ি মৌজার হেডম্যান খুলা মোহন তঞ্চঙ্গ্যা বলেন যে, তার মৌজার ৪০০০ একরের মধ্যে ৩০৯৩ একর ভূমি বন বিভাগ বেদখল করেছে। ডিএফও-এর প্রতিনিধি শামসুল হুদা জানান যে, নতুন করে ভূমি অধিগ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা বন বিভাগের নেই। তবে পুরনো বাগানের গাছগুলো কেটে নতুন করে সেখানে বাগান সৃষ্টি করা হবে। ৩৩৪নং মৌজার হেডম্যান মিশু মারমা জানান যে, খোদ তার ভূমিও বন বিভাগ দখল করেছে। মৌজা থেকেও হয়তো বিতারিত হতে হবে। কেননা ইতিমধ্যে ৭১৫ একর জায়গা বেদখল করা হয়েছে। নিজেদের জায়গাতে বসবাসের জন্য বন বিভাগের সাথে বাকবিতন্ডা করায় ২০০ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের বাগ-বাগিচার কথা বাদ, মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাহ করার মত কোন ভূমিও অবশিষ্ট নেই। চেয়ারম্যান নিউচিং মারমা জানান যে, পাল্পউড বাগান সৃজনের ফলে সকল বন ধ্বংস হতে চলেছে। পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে।

রাজভিলার চেয়ারম্যান ও হেডম্যান রুই প্রু অং চৌধুরী জানান যে, পাল্পউড বাগান করার জন্য যে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে হেডম্যানদের কিছুই জানানো হয়নি। সম্পূর্ণ তাদের অমতে ভূমি বেদখল করায় কত পরিমাণ জায়গা পাল্পউড বিভাগের অধীনে রয়েছে সেটা তিনি জানেন না। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, নানা তালবাহানা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ভূমি বেদখল করা হয়েছিল। উক্ত ইউনিয়নের সদস্য সাজাই প্রু মারমা জানান যে, সহজ সরল পাহাড়ীরা অর্থাভাবে তাদের জায়গা বন্দোবস্ত করতে পারেনি। রেকর্ডকৃত জায়গাও বেদখল করা হয়েছে। ধুমফুরী মারমা এর অন্যতম শিকার। তাই তিনি দাবী করেন যে, যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদেরকে পুনর্বাসন করতে হবে। জায়গা ফেরৎ দিতে হবে।

রোয়াংছড়ি মৌজার হেডম্যান ও চেয়ারম্যান মুহা চিং মারমা জানান যে, পাল্পউড বাগানের ভূমি অধিগ্রহণের সময় বলা হয়েছিল যে ১৫ বছর পর তাদের ভূমি ফেরত দেয়া হবে। বাগান হতে লাভের ২৫% জায়গার মালিকদের এবং ২৫% ক্ষতিগ্রস্থদের দেয়া হবে। কিন্তু ২৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও লাভ তো দুরের কথা, ভূমিও ফেরত দেয়া হয়নি। জুম চাষ করা এবং বন থেকে ঘরবাড়ী বানানোর জন্য বাঁশ, শন সংগ্রহ করাও যাচ্ছে না। কিছুদিন আগে স্বয়ং বান্দরবানের জেলা প্রশাসক রোয়াংছড়ি সফরকালে বিশাল জায়গার কথা উল্লেখ করে নতুন করে অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং ভূমি ফেরত প্রদান না করার যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ২নং আলিখ্যং ইউপি চেয়ারম্যানের বক্তব্যে। তিনি জানান যে, ২ বছর আগে ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে আমরা

আপত্তি করি। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন কাজ হয়নি। ৩২৩নং মৌজার হেডম্যান চাইথোয়াই হ্লা চৌধুরী ক্ষোভের সাথে জানান যে, ভূমি দখলের সময়ে বলা হয়েছিল প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা ও ৩ বছরের রেশন প্রদান করা হবে। কিন্তু বাস্তবে তারা কিছুই পায়নি। ক্ষতিগ্রস্থ কোন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়নি। তাই নতুন করে যেন ভূমি বেদখল না করা এবং পুরনো জায়গা ফেরত দেয়ার জন্য তিনি দাবী জানান। ৩নং চিৎমরম ইউপির চেয়ারম্যান থোয়াই চিং মারমা স্পষ্ট জানান যে, তিনি পাল্পউড বাগান সৃষ্টির বিপক্ষে। কর্ণফুলী পেপার মিলের (কেপিএম) জন্য অনেক পাহাড়ীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কেপিএম রাক্ষসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আরো পাল্পউড বাগানের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আমাদের সর্বনাশ হবে।

এসব ভূমিতে জুম্ম জনগণ চিরাচরিত সামাজিক প্রথানুসারে জুম চাষসহ চারণ ভূমি, বনজ সম্পদ আহরণ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এসব জমি-জমা জুম্ম জনগণ সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে ভোগদখল করে আসছে। ২০০/২৫০ বছরের পুরনো গ্রামগুলো বন বিভাগের দ্বারা বেদখল হওয়ায় এখন করুণ ও মর্মান্তিক দৃশ্য নিয়ে নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। গ্রামের লোকগুলো জেলে বন্দী, কেউ কেউ পলাতক, অনেকে উচ্ছেদের আশংকায় ভীত। গরু চড়াতে বা চাষ করতে গিয়ে তারা বন বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা মারধোরের শিকার। জীবন ধারণের জন্য জুম চাষের কোন জমি আর অবশিষ্ট নেই। ভূমিহীন ও অনিশ্চিত জীবন নিয়ে অন্ধকার ভবিষ্যত তাড়া করছে গরীব নিরন্ন পাহাড়ীদেরকে। যেন তারা সবাই 'জীবন আমাদের নয়' অভিশাপ বহন করে চলেছে।

বন বিভাগের সাম্রাজ্য বিস্তার বর্তমানে যেভাবে ভয়াবহতার দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এর মধ্য দিয়ে ভূমি বেদখলের যে নীতি সরকার গ্রহণ করছে তাতে জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে। বনায়ন প্রকল্পগুলো 'প্রাকৃতিক কারাগারে' পরিণত হয়ে চিড়িয়াখানার অসহায় প্রাণীতে পরিণত করছে পাহাড়ীদেরকে। ভূমি কমিশন কার্যকর না করে ভূমি বেদখল করা, সেটেলার গ্রাম সম্প্রসারণ করা এবং জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকারের অস্বীকৃতিকে জিইয়ে রেখে সরকার এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে। যার ফলে মুষ্টিমেয় বন বিভাগের কর্মকর্তা লাভবান হলেও ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার দায়ভার সরকারকেই বহন করতে হবে।

২. সেটেলারদের দ্বারা উচ্ছেদের মুখে সাপমারা গ্রাম

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার ২১০নং যোগ্যছোলা মৌজার ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত সাপমারা গ্রামের আদিবাসী পাহাড়ী জনগণ পার্শ্ববর্তী সেটেলারদের কর্তৃক বেশ কিছুদিন থেকে নির্যাতন-নিপীড়ন ও জীবন নাশের হুমকীর শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি নানা ষড়যন্ত্র করে হুমকী দিয়ে তাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পাঁয়তারা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সেটেলারদের এই নানামুখী অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রে অতীষ্ট হয়ে গত ১১ নভেম্বর ২০০২ গ্রামবাসীরা এই অমানবিক অত্যাচার, নির্যাতন ও নিরপত্তাহীনতা থেকে অব্যাহতি চেয়ে শান্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে। স্মারকলিপিতে গ্রামবাসীদের পক্ষে স্বাক্ষর প্রদান করেন চিত্তরঞ্জন ত্রিপুরা পীং রিক্ষারঞ্জন ত্রিপুরা, হেবল ত্রিপুরা পীং দহনচরণ ত্রিপুরা প্রমুখ। স্মারকলিপিতে পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের জন্য সেটেলারদের মধ্য থেকে যাদের নামে অভিযোগ করা হয়েছে তারা হলো মানিক মিয়া পীং ভোলা, রাজ্জাক (কোম্পানী), নুরুল ইসলাম, নুরনবী, শামসুল হুদা ও হাসেম মিয়া প্রমুখ। উল্লেখ্য এরা সবাই সাপমারা গ্রামে বসতিকারী সেটেলার। বিগত আশি দশকে বিভিন্ন সময়ে অপরাপর সমতল অঞ্চল হতে এখানে এসে অবৈধভাবে জায়গা বেদখল করে বসবাস শুরু করে। জানা গেছে উক্ত সেটেলারদের নেতৃত্বে গত ১৯ নভেম্বর ২০০২ শ্রীমতি পাখি ত্রিপুরাকে ধর্ষণ ও নির্যাতন করা হলে এর ২/৩ দিন পরই পাখি ত্রিপুরা মৃত্যুবরণ করেন। গত ৮ নভেম্বর ২০০২ ফুল কুমার ত্রিপুরা পীং আশীরায় ত্রিপুরাকে অন্যায়ভাবে চোর সাব্যস্থ করে মারধর করা হয়। গত ৯ নভেম্বর ২০০২ ফুল কুমার ত্রিপুরা, পিটার ত্রিপুরা পীং রিক্ষাচন্দ্র ত্রিপুরা, চিত্তরঞ্জন ত্রিপুরা পীং রিক্ষাচন্দ্র ত্রিপুরা, সতীশচন্দ্র ত্রিপুরা পীং আজারাম ত্রিপুরাকে জীবননাশের হুমকী দেয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের দিয়ে ঘরের জিনিসপত্র চুরি ও ছিনতাই করিয়ে ঝগড়া সৃষ্টির পাঁয়তারা করে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হয়ে থাকে। আর সেটেলারদের মুরগী, ছাগল ইত্যাদি মারা গেলে তারা গোপনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পাহাড়ীদের ক্ষেতে-খামারে রেখে আসে। পরে পাহাড়ীদের কর্তৃক এই মুরগী, ছাগল মারা গেছে বলে অভিযোগ তুলে পাহাড়ীদেরকে নানাভাবে হয়রানি ও ক্ষতি করার চেষ্টা করে। পাহাড়ীদেরকে এইভাবে অব্যাহত নির্যাতন ও ষড়যন্ত্র করার পেছনে মূল কারণ হলো তাদেরকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে তাদের জায়গাজমি বেদখল করা। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ বিষয়ে গ্রামবাসী কর্তৃক জেলা প্রশাসকের বরাবরে পেশকৃত স্মারকলিপির প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে জেলা প্রশাসন থেকে পুলিশ সুপারকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে প্রশাসন কর্তৃক এখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সেটেলার সন্ত্রাসীরা হুমকী ও হয়রানি করে চলেছে এবং পাহাড়ীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ক্রমশঃ উচ্ছেদের মুখে রয়েছেন।

৩. বান্দরবানে লীজ প্রদান

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার খর্ব হওয়া ও ভূমির দখল হাতছাড়া হবার ঘটনা দীর্ঘদিনের। তবে এটা আরও ব্যাপক ও পাকাপোক্ত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সত্তর দশকের শেষ ও আশির দশকের প্রথম দিকে। সেই সময় অত্যন্ত অমানবিক ও নির্দয়ভাবে জুম্মদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করে জায়গাজমি বেদখল করা হয় এবং তৎস্থলে পর্যায়ক্রমে কয়েক লক্ষ বহিরাগত বাঙালিকে পুনর্বাসন করা হয়। সেই থেকে কখনো

আইনকে সম্পূর্ণভাবে লংঘন করে, কখনো আইন বা প্রশাসনকে ব্যবহার করে, কখনো বনায়নের নামে ইত্যাদি নানা পন্থায় বেদখল বা হাতছাড়া হয়েছে যুগ যুগ ধরে বসবাস ও ভোগদখল করা জুম্মদের আবাসভূমি। তন্মধ্যে লীজ দেয়া বা নেয়া হচ্ছে অন্যতম এক পদ্ধতি। যার মাধ্যমে বেদখল করা হয়েছে জুম্মদের অধিকারভূক্ত শত শত একর জমি। এসব লীজ নেয়া বা প্রদান করা হয় বিভিন্ন বাগান করার নামে। প্রায়ই মিথ্যা চৌহদ্দির ভিত্তিতে, সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের যোগসাজশে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অশিক্ষিত সহজ সরল অনেক পাহাড়ী পরিবার জানে না যুগ যুগ ধরে যে ভিটেমাটিতে সে বসবাস করেছে তা লীজ নিয়েছে বিত্তশালী বা প্রভাবশালী বহিরাগত কোন বাঙালি। ফলে সেই পাহাড়ীর অনিবার্য পরিণতি হয় নিজ ভূমে পরবাসীতে।

সম্প্রতি বান্দরবানে পাওয়া গেছে তেমনি এক মিথ্যা লীজ প্রদানের প্রমাণ। দেখা গেছে, ১৯৯৪ সালে বান্দরবান জেলায় বহু বৎসর যাবৎ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী দেখিয়ে মোঃ আয়ুব আলী পীং আব্দুল আলীম জেলার সদর উপজেলাস্থ ৩১৮ নং কুহালং মৌজার বিভিন্ন দাগের ২৫ একর ভূমি লীজ পাওয়ার আবেদন জানিয়ে জেলা প্রশাসকের বরাবরে দরখাস্ত করে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত জেলা কানুনগো কাজী বজলুর রহমান সংশ্লিষ্ট মৌজার ৩৬২৬, ৩৭৪৩, ৩৭০৫ ও ৩৬২৭নং দাগের মোট ২৫ একর পাহাড় ভূমি বাছাই করে তা খাস ও বিবাদমুক্ত উল্লেখ করে ৪০ বছর মেয়াদী ইজারা প্রদানের সুপারিশ প্রদান পূর্বক এক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পেশ করে। এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালের জানুয়ারীতে সালামী ও জামানত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর উক্ত ২৫ একর জমি লীজও দেয় মোঃ আয়ুব আলীকে। পরবর্তীতে ২০০১ সালে লীজ প্রদানের ঘটনা জানাজানি হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী অধিবাসী পাহাড়ীরা এই লীজ বাতিলের জন্য জেলা প্রশাসকের বরাবরে আবেদন করে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে বান্দরবান সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহিউদ্দিন আল ফারুক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে লীজ মামলার তফসিলে বর্ণিত জমি সরেজমিনে পরিদর্শনে যান। সহকারী কমিশনারের রিপোর্টেও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, অত্যন্ত অন্যায় এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মোঃ আয়ুব আলীকে এই লীজ প্রদান করা হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, লীজ মামলায় বরাদ্দকৃত জমি কুহালং মৌজার চড়ুইপাড়া এলাকার ভিতরে। চড়ুইপাড়ার উপরে কয়েকটি পাহাড় ডিঙিয়ে তফসিলে বর্ণিত জমিতে গিয়ে দেখা যায় যে, আশেপাশে কোথাও বাঙালী বসতি নেই। জুম্মদের পাড়ার ভিতরে বলে জমিতে পূর্ব থেকে পাহাড়ীদের দখল ও চাষাবাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়, যে চারটি দাগে ২৫একর জমি লীজ দেয়া হয়েছে এর প্রতি দাগের জমিতে লীজের অংশ চৌহদ্দি দ্বারা সনাক্ত করা হয় নাই। তাই লীজ মালিক মোঃ আয়ুব আলী প্রতিটি দাগে ইচ্ছামতো তার সীমানা নির্ধারণ এবং সম্প্রসারণ করেছেন যার ফলে স্থানীয় জুম্মদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। লীজ দেয়া বা নেয়ার সময় বিধি মোতাবেক তদন্তের জন্য উপজেলায় নথি প্রেরণ করা হয়নি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হেডম্যানের প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়নি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টের উপসংহারে লেখা হয় যে, একটি পাহাড়ী অধ্যুষিত পাড়ার ভিতরে যথাযথভাবে তদন্ত না করে ২৫ একর জমি লীজ দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত দরিদ্র পাহাড়ী বাসিন্দারা এ জমিগুলো ভোগদখল করে আসছে। তাছাড়া লীজ মামলার নথিতে নানা অনিয়ম রয়েছে। এ অবস্থায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনস্বার্থে প্রদত্ত লীজ বাতিল করা প্রয়োজন বলে সুপারিশ করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বেআইনী এই লীজ বাতিল করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

৪. ভূষণছড়া হেডম্যানের জমিতে মসজিদ নির্মাণ

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ১৪৮নং ভূষনছড়া মৌজার হেডম্যান নিরুপম দেওয়ানের বন্দোবস্তকৃত জমির (হোল্ডিং নং R-৩/৬৬-৬৭ইং) উপর ভূষনছড়া সেটেলাররা একটি মসজিদ নির্মাণ শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সনে বিভিন্ন সমতল জেলা থেকে বহিরাগত বাঙালী এনে ভূষনছড়া এলাকায় বসতি প্রদানকালে হেডম্যান নিরুপম দেওয়ান নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে। উপরন্তু ১৯৮৪ সনে ভূষনছড়া এলাকায় জুম্মদের উপর সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটেলাররা সংঘবদ্ধভাবে গণহত্যা (ভূষনছড়া গণহত্যা নামে সমধিক পরিচিত) চালালে তিনি আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। এ সময় সেটেলাররা তার জায়গা-জমি বেদখল করে নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কাজ শুরু না হওয়ার কারণে এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন না হওয়ার হওয়ার ফলে এখনো তিনি সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত তার জমি ফেরত পায়নি। ইতিমধ্যেই সেটেলাররা তার জমির উপর একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করে। আরো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, উক্ত মসজিদ নির্মাণের অর্থ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ উক্ত মসজিদ নির্মাণের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিও জারী করেছে। তার জায়গা বেদখল করে মসজিদ নির্মাণ এবং এই অবৈধ কাজে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ করার প্রতিবিধান চেয়ে তিনি ১৬ অক্টোবর ২০০২ রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বরাবরে একটি দরখাস্ত দেন। ভূমি কমিশন কর্তৃক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মসজিদ নির্মাণ স্থগিত রাখার জন্য তিনি আবেদন জানান। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী ও রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের বরাবরে অভিযোগ করেও তিনি কোন সুরাহা পাননি। অপরদিকে আরো জানা গেছে বরকল উপজেলাধীন পাকিস্তান টিলা নামক স্থানে স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীরা একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিলে বরকল উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), সেটেলার নেতৃবৃন্দ ও সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা বাধা প্রদান করছে। ফলে উক্ত স্থানে মন্দির নির্মাণ কাজ বর্তমানে ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এ নিয়ে এলাকায় জুম্ম অধিবাসীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসন অব্যাহতভাবে চলছে

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত বহিরাগত বাঙালী অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং একটি বিশেষ মহল অত্যন্ত সুকৌশলে ও সূক্ষ্মভাবে এই বেআইনী বহিরাগত অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে - এ অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে কি আবার সরকারীভাবে বা সরকারী সংস্থার ছত্রছায়ায় নীরব বহিরাগত পুনর্বাসন চলছে?

অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানরত বহিরাগত সেটেলারদের আত্মীয়-স্বজন হিসেবে অথবা অপরাপর সমতল অঞ্চল হতে ছিন্নমূল মানুষ দুয়েক পরিবার করে প্রায়ই প্রথমে পার্বত্য জেলা শহরগুলিতে প্রবেশ করছে। চট্টগ্রাম হয়ে বাস অথবা নানা মাধ্যমে মূলতঃ সন্ধ্যায় বা রাত্রে একেবারে পোটলাপুটলীসহ তারা এসে পড়ছে পার্বত্য জেলা শহরগুলিতে। শহরগুলির কোন অফিস প্রাঙ্গণ বা কোন না কোন স্থানে রাত কাটিয়ে পরদিন সাতসকালে সেখান থেকে তারা বিভিন্ন গুচ্ছগ্রাম, বাজার এলাকা বা সেটেলার এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। তারা যাচ্ছে যাত্রীবেশে গাড়ীতে বা লঞ্চে। কোন সময় তাদের কারও সাথে ঝগড়া বা বাকবিতন্ডা বাঁধছে ভাড়া দেয়া না দেয়া নিয়ে গাড়ীর কন্ট্রাক্টর বা লঞ্চের কেরানীর সাথে। তারা জানে না তারা ঠিক কোথায় থামবে বা নামবে। তারা শুধু মুখস্থ করা ঠিকানা হরিণা, ভূষনছড়া, লংগদু, দীঘিনালা ইত্যাদি স্থানে নামিয়ে দিতে বলছে। 'এটা কোন ন্যাচারাল মাইগ্রেশন' বা স্বাভাবিক আগমন নয় বা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের সংখ্যালঘু করে নিজভূমে পরবাসী করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একটি বিশেষ মহলের সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া। এদিকে সাম্প্রতিক প্রাপ্ত কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য ও আলামতের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষক মহল ধারণা করছে যে, খোদ সরকারী একটি গোষ্ঠী বা সরকারী সংস্থার ছত্রছায়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার নীরব বহিরাগত পুনর্বাসন চলছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে আবাসন প্রকল্পের নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ বিষয়ে পার্বত্য জেলার উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনারের কার্যালয়ে এক নির্দেশপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১/১০/২০০২ জারীকৃত এই নির্দেশমূলে উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)-র কার্যালয় হতে স্ব স্ব উপজেলাধীন বিভিন্ন হেডম্যানদের কাছে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করে একটি পত্র পাঠানো হয়েছে। সেখানে প্রতি হেডম্যানকে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের কথা বলে পরিবার পিছু ন্যূনতম ৮শতক জমি বরাদ্ধ দেয়াসহ কমপক্ষে ৫০টি পরিবারকে সামগ্রিক পূনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের জন্য নিষ্কন্টক খাসজমি বাছাইয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পত্রে বিষয়টি অতীব জরুরী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ও সচেতন মহলে বিষয়টি বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করেছে। কারো কারো মতে, ভূমিহীন ও গৃহহীন হিসেবে কিছু জুম্ম পরিবার এই প্রকল্পে অন্ত ভূক্ত করা হলেও মূলতঃ বহিরাগত সেটেলার বাঙালীদের পুনর্বাসন করাই এই প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য। অপরদিকে এই প্রশ্নটিও উঠেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমিহীন ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে সুনির্দিষ্ট কর্তব্য এবং নির্দেশনা নির্ধারিত থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে কেন এই জমি বাছাই, জমি বরাদ্ধ এবং ভূমিহীন পুনর্বাসন প্রক্রিয়া হাতে নেয়া হচ্ছে? উল্লেখ্য, এই ভূমি সমস্যাটি পার্বত্য সমস্যার অন্যতম একটি দিক। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনেও এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তিন পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ যে কোন জায়গাজমি, পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।"

এদিকে জানা গেছে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি থানার লোগাং ইউনিয়নের বটতলা এলাকা এবং মাছ্যছড়া তথা মরামাছ্যছড়া ও জেদামাচ্যছড়া এলাকা সম্প্রতি স্থানীয় বিডিআর এর সিও জরিপ করেন। অপরদিকে লতিবান এলাকায় এবং দীঘিনালার কবাখালীর কিছু কিছু স্থানে বসতির উদ্দেশ্যে সেটেলাররা সদলবলে জঙ্গল সাফ করে। এই সব এলাকা পাহাড়ীদের রেকর্ডীয় জায়গাজমি। সাম্প্রতিক এই ঘটনাবলীর আলোকে এই প্রশ্নটি এখন উঠেছে যে, সরকার বা সরকারের একটি গোষ্ঠীই এই বহিরাগত সেটেলার পুনর্বাসনের পাঁয়তারা করছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে আশির দশকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে লক্ষ লক্ষ বহিরাগত সেটেলার পুনর্বাসন শুরু হলে পার্বত্য সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করে এবং সংখ্যালঘু জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ গভীর সংকটে পড়তে বাধ্য হয়।

বরকল উপজেলায় সেটেলার গ্রাম সম্প্রসারণ

রাঙামাটি জেলার বরকল থানার ২২নং কুরকুটিছড়ি মৌজার বিলছড়া নামক এলাকায় সেটেলার বাঙালীরা জোরপূর্বক পাহাড়ীদের জায়গাজমি বেদখল করে নিয়েছে। সুবলং ইউনিয়নের বরুনাছড়ি ও বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে এসব সেটেলার উক্ত জমি দখল করে নেয়। ইতিমধ্যে প্রায় শতাধিক পরিবার ঘরবাড়ী তৈরী করে সেটেলার গ্রাম গড়ে তুলেছে। গত ১১ ডিসেম্বর আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সরেজমিনে এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া পরিদর্শন করে প্রশাসনকে সেটেলারদের উচ্ছেদ করার নির্দেশ প্রদান করলেও প্রশাসন তা কার্যকরী করেনি। অত্র মৌজার হেডম্যান ও কার্বারীরা নিরুপায় হয়ে পার্বত্য মন্ত্রীর শরণাপন্ন হলেও তার কোন ফল দেখা যাচ্ছে না। ৭ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মণিস্বপন দেওয়ান জেলা প্রশাসক রাঙামাটিকে জোরপূর্বক জায়গা দখল যাতে হতে না পারে এবং কেউ যেন এধরনের কাজে উৎসাহিত না হয় তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বললেও তার কোন কাজ হয়নি। বিগত বছর থেকে সেটেলাররা প্রথমতঃ তরমুজ চাষের বাহানা করে এসব এলাকা বেদখল শুরু করে। সেসময় হতে তারা তরমুজ চাষের পাশাপাশি কলা বাগান করে চলেছে। এখন সেনাবাহিনীর মদতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বাড়ীঘর নির্মাণ করে ফেলেছে। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন প্রতিদিন তাদের ভোগদখলীয় ও বন্দোবস্তকৃত জায়গাজমি সেটেলারদের দ্বারা বেদখল হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ীদের চলাচলে এসব সেটেলাররা বাঁধা প্রদান করছে। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী গ্রামগুলো যে কোন মুহর্তে সেটেলারদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হতে পারে বলেও অনেকে আশংকা প্রকাশ করছেন। সর্বশেষ খবরে জানা যায় এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ

খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি থানাধীন পাকুজ্যাছড়ি সেটেলার গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করে সেটেলাররা ২৫০নং লেমুছড়ি মৌজার ১৯ জন পাহাড়ীর ১১০ একর এবং চংড়াছড়ি মৌজার ৪৪ জন পাহাড়ীর ১৮৩ একর মিলে মোট ২৯৩ একর জমি দখল করে নিয়েছে। এসব জমি হোল্ডিং নম্বরসহ পাহাড়ীদের বন্দোবস্তী রয়েছে। সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণের কার্যক্রমে যুক্ত থাকায় ২০০১ সালে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে উচ্ছেদ নোটিশ, আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক আয়োজিত সভায় সেটেলারদের বসতবাড়ী তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত থাকা সত্ত্বেও পাহাড়ীদের জমির উপর সেটেলারদের নির্মিত ঘরবাড়ী বহাল তবিয়তে রয়েছে। বর্তমানে টিনের ছাউনিসহ মজবুত ঘরবাড়ী তৈরী ও দোকানপাট নির্মাণ করে সেটেলাররা দিব্যি আরামে এসব এলাকায় বসবাস করছে। আর জায়গাটা যেহেতু রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কের দুই পাশে অবস্থিত এবং পাশেই এপি ব্যাটেলিয়ন ও সেনা ক্যাম্প রয়েছে তাই কোন ঘটনা হলেই সেনা সদস্যদের ছত্রছায়ায় গাড়ী থামিয়ে পাহাড়ীদের উপর হামলা চালিয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে মহালছড়ি থানাধীন চংড়াছড়ি ও লেমুছড়িতে জুম্মদের জায়গা-জমির উপর সেটেলারদের বসতবাড়ী নির্মাণকালে স্থানীয় জুম্মরা বাধা দিলে সেটেলাররা ২৪ নভেম্বর ২০০১ তারিখে হামলা চালায়। এ হামলায় মহালছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আর্কিমিডিস চাকমাসহ ২০ জন জুম্ম গুরুতরভাবে আহত হন।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে এবং ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে মহালছড়ি উপজেলার পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামের সেটেলাররা জয়সেন কার্বারী পাড়া এপি ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্পের চারপাশে পর্যায়ক্রমে ১৭০টি ঘর-বাড়ী তৈরী করে পাহাড়ীদের জায়গা-জমি দখল করে নেয়। এসব বসতবাড়ী তুলে নিয়ে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ১২ এপ্রিল ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান যতিন্দ্র লাল ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-মেম্বার ও বিভিন্ন মৌজার হেডম্যানদের নিয়ে এক বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে নির্মিত বাড়ীঘর তুলে নিয়ে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরে ১৯ এপ্রিল ২০০১ এ বিষয়ে খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কম্যান্ডারের সাথেও সন্তু ল্যরমার বৈঠক হয়। পরবর্তীতে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সেটেলার ঘর-বাড়ী উচ্ছেদ নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটেলারদের গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেয়া হয়নি। অধিকন্তু পরবর্তীতে সেটেলাররা রাতারাতি আরো ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে। এসব ঘর-বাড়ী সেনাবাহিনীর আর্থিক সহায়তায় নির্মিত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে ২০০১ সালের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটির সভায়ও সম্প্রসারিত গুচ্ছগ্রাম সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

সদ্য অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার তালিকাভূক্ত হচ্ছে

অতি সম্প্রতি তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন স্থানে সদ্য আগত অনুপ্রবেশকারীরা অবৈধভাবে ভোটার তালিকাভূক্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একটি বিশেষ মহল বিশেষ উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ভাসমান এই সেটেলারদের স্থায়ীত্ব দেবার জন্য তাদেরকে ভোটার তালিকাভূক্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জানা গেছে অতি সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী এলাকায় তালেব মিয়ার নেতৃত্বে একটি বিশেষ মহলের প্ররোচনায় প্রায় দুই হাজার সেটেলারের একটি তালিকা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য স্থানীয় নির্বাচন অফিসে আবেদন করা হয়। বিষয়টি স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে জানাজানি হলে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। পরে এব্যাপারে কবাখালী ইউপি চেয়ারম্যান যতীন বিকাশ দেওয়ানের নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রতিবাদ এবং আপত্তি জানানো হয়। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত উক্ত অনুপ্রবেশকারীদের আবেদন বাতিল হয়েছে বলে জানা যায়নি। এছাড়া রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার ৫ শতাধিক অনুপ্রবেশকারীও ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে আবেদন করেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এই বিধানকে লঙ্ঘন করে সরকার গত ২০০০ সালে বহিরাগত চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ও সেটেলারদেরও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে এবং উক্ত ভোটার তালিকা দিয়ে ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সাম্প্রদায়িক ও চুক্তিবিরোধী বক্তব্য

প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী রাঙামাটি সফরে এসে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে স্পষ্ট বলেছেন চুক্তিবিরোধী প্রসিত সঞ্চয় চক্রের বিরুদ্ধে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। তিনি প্রসিত-সঞ্চয় চক্রের নেতৃত্বে ইউপিডিএফ নামধারী সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করারও চেষ্টা চালান। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের অপহরণ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, এই সন্ত্রাস কেন্দ্রীয়ভাবে সুসংগঠিত এবং এতে রাজনৈতিক উৎসাহ রয়েছে। তিনি ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী উপজেলা সংলগ্ন রানীরহাট ঠান্ডাছড়ি চা বাগানের ম্যানেজার কাজী নুরুল আনোয়র জাহাঙ্গীরকে অপহরণ এবং মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে উদ্ধারের প্রসঙ্গ টেনে উপস্থিত বাঙ্গালীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আর যদি কোন বাঙালী অপহৃত হয় এবং একটা টাকাও যদি মুক্তিপণ দিতে হয় তাহলে ফটিকছড়ির রাস্তা (খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম), রানীরহাটের রাস্তা (রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম) ও কাপ্তাইয়ের রাস্তা (কাপ্তাই-চট্টগ্রাম) বন্ধ করে দেবেন এবং পাহাড়ীরা কোন দিকে আসা-যাওয়া করে দৃষ্টি রাখবেন। তিনি গত ২৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কাতেবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

চুক্তি মোতাবেক ভোটার তালিকা প্রসঙ্গ

পার্বত্য জেলায় আসন্ন ইউপি নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং ভোটার তালিকা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। গত ১৯/১২/২০০২ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর চাকমার নেতৃত্বে স্থায়ী বাসিন্দাদের একটি প্রতিনিধিদল রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে যথাক্রমে জেলা প্রশাসক ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন।

গত ২০০০ সালের মে-জুন মাসে সারা দেশের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রণীত ভোটার তালিকায় অস্থায়ী ও বহিরাগত হাজার হাজার লোককে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন বিগত সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারী পরিকল্পণাধীনে দেশের বিভিন্ন জেলা হতে চার লক্ষাধিক পুনর্বাসিত অ-উপজাতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, বিডিআর, ভিডিপি, এপিবি এর হাজার হাজার সদস্য, সর্বোপরি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত শত শত চাকুরীজীবি এবং অর্থনৈতিক সূত্রে কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক-মজুর ও ব্যবসায়ী। ফলে উক্ত ভোটার তালিকায় স্থায়ী বাসিন্দা ভোটারের চাইতে অস্থায়ী বাসিন্দা ভোটারের সংখ্যা অনেক এলাকায় বেশী হয়ে যায়। এই ভোটার তালিকা প্রণয়ন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এছাড়া ২০০২ সালের সাম্প্রতিক কালের মাসগুলোতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হাজার হাজার বহিরাগত লোককে বিভিন্ন ইউনিয়নে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো কোনো ইউনিয়ন হতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এর কোন প্রতিবিধান হয়নি। এমতাবস্থায় বর্তমান ভোটার তালিকা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে স্থায়ী বাসিন্দাদের ভোটাধিকার তথা গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হতে বাধ্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'খ' খন্ডের ৯নং ধারা ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সমূহের ১৭ নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন, (২) তাঁর বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়, (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাকে সামাজিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করে থাকেন, (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন। অপরদিকে চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩নং ধারা ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সমূহের ১১নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, 'অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা' বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাকে বুঝানো হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের ২(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভূক্ত হবার অধিকারী হবেন যদি তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন এবং ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৮(১) ধারায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে যিনি কোন ভোটার এলাকায় সচরাচর বা সাধারণতঃ বসবাস করেন তিনি সেই ভোটার এলাকার বাসিন্দা বলে গণ্য হবেন। উক্ত অধ্যাদেশের ৮(২) ধারায় কেবলমাত্র আবেদন সাপেক্ষে ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বা সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে কার্যোপলক্ষে বসবাসরত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভূক্ত করার বিধান রয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে বিগত ২০০০ সালের মে-জুন মাসে প্রণীত ভোটার তালিকা দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ন্যায় আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হলে -(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণভাবে লংঘন করা হবে এবং উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। (২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগণ তাদের পছন্দমত ও উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার অধিকার হতে বঞ্চিত হবে। (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা অস্বীকার করা হবে। (৪) উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্থ হবে ও (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে এ সমস্যা আরো জটিলতর হয়ে পড়বে। তাই স্মারকলিপিতে - (১) পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এর ১৭নং ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন স্থগিত রাখা এবং (২) যে যোগ্যতার ভিত্তিতে পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হবে সে একই ভোটার তালিকা যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় সংসদ, পৌরসভা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে ব্যবহৃত হতে পারে তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নির্বাচন বিধিতে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী করা হয়।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম হেডম্যান সমিতির সভাপতি ও রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন উপদেষ্টা বিনয় কুমার দেওয়ান, উপজাতীয় কাঠ ব্যবসায়ী ও জোত মালিক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার দেওয়ান, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সহ সভাপতি অরুমিতা চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুদীর্ঘ চাকমা, উপজাতীয় সামাজিক ফোরামের সদস্য-সচিব সুনীতি বিকাশ চাকমা, উপজাতীয় ঠিকাদার ও ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিলের সভাপতি মানস মুকুর চাকমা, মহিলা সমিতির সভানেত্রী মাধবী লতা চাকমা, আদি ও স্থায়ী বাঙ্গালী কল্যাণ পরিষদের সভপতি ইউসুফ আলম, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন রাঙ্গামাটি জেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব এম জিসান বখতিয়ার, জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি গুণেন্দু বিকাশ চাকমা প্রমুখ।

জনসংহতি সমিতির ৭ম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করার ঘোষণা

৫-৮ নভেম্বর ২০০২ চারদিন ব্যাপী খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াপুর কমিউনিটি সেন্টারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৭ম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট ৮ম কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন করা হয়। সভাপতি পদে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সহ সভাপতি পদে রূপায়ণ দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক পদে চন্দ্রশেখর চাকমা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে শক্তিপদ ত্রিপুরা নির্বাচিত হন। এতে জনসংহতি সমিতির জেলা, থানা ও ইউনিয়ন শাখা থেকে আড়াই শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এছাড়া মহিলা সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও যুব সমিতির অর্ধ শতাধিক নেতা-কর্মীও পর্যবেক্ষক হিসেবে সম্মেলনে যোগদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অমিয় সেন চাকমা। বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির প্রতিনিধি খগেশ্বর ত্রিপুরা, হেডম্যান সমিতির প্রতিনিধি উদয় শংকর চাকমা, আদি ও স্থায়ী বাঙালি কল্যাণ পরিষদের নেতা গফুর আহমেদ তালুকদার, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি প্রভাকর চাকমা প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তিনদিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের প্রারম্ভে আলোচনা করেন শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। এরপর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সাধারণ সম্পাদক চন্দ্র শেখর চাকমা সামগ্রিক প্রতিবেদন পেশ করেন। উপস্থাপিত সামগ্রিক প্রতিবেদনসহ জাতীয় সম্মেলনে আন্তর্জাতিক, বাংলাদেশ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনসহ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা, পার্টির সাংগঠনিক অবস্থা, পার্টির ভবিষ্যত কর্মপন্থার উপর সাধারণ আলোচনা করা হয়। আলোচনা-পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী গ্রহণ করা হয়-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করা; (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি এবং প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স গঠন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (৪) স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন পূর্বক ভূমি কমিশন গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (৬) কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ স্থায়ী বাঙ্গালীদের পুনর্বাসনসহ প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা; (৭)'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসন বাতিল পূর্বক সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র সকল অস্থায়ী ক্যাম্প চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাহার করা; (৮) চুক্তি ও আইন লংঘন করে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকদের নিকট স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের অর্পিত ক্ষমতা বাতিল করার দাবী জোরদার করা; (৯) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়নসহ পরিষদসমূহ কার্যকর করা; (১০) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, আইন-শৃংখলা ও পুলিশ (স্থানীয়)সহ পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরযোগ্য বিষয়সমূহ কার্যকর করা; (১১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও পরিষদীয় প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা; (১২) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের জন্য অধিকতর সংখ্যক কোটা সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (১৩) নারী মুক্তি আন্দোলন জোরদার করা এবং সমাজ উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে মহিলাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণ করা; (১৪) সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত ও দক্ষিণপন্থী দুলাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করা; (১৫) দেশের অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে ইস্যু ভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে সামিল হওয়া; (১৬) বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে যথাযথ ও সম্মানজনক পুনর্বাসনের জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (১৭) ইউপিডিএফ নামধারী চুক্তি বিরোধী চক্রের সন্ত্রাসী তৎপরতা কঠোরভাবে মোকাবেলা ও নির্মূল করা; (১৮) পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ ব্যাপকভাবে ধ্বংস সাধন রোধকল্পে আন্দোলন জোরদার করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করার উপর প্রাধান্য দেয়া; (১৯) স্থায়ী পাহাড়ী-বাঙ্গালী জনগণের উপর অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার করা; (২০) পাহাড়ী-বাঙ্গালী স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য সংহতি জোরদার করা; (২১) পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও বেকার যুবক-যুবতীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (২২) জুমচাষী ও ফরেষ্ট ভিলেজারদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের উপর গুরুত্বারোপ করা; (২৩) কাপ্তাই বাঁধের মৌসুম অনুযায়ী বাস্তবসম্মতভাবে জলসীমা নির্ধারণ করা এবং কাপ্তাই হ্রদের জল সম্পদ সুষ্ঠ ব্যবহারে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (২৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের অপোকৃত অনগ্রসর জুম্ম জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা বিস্তার ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (২৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্থ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করা; (২৬) অবৈধভাবে ভূমি অধিগ্রহণ, লিজ ও বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখা; (৭) বন বিভাগ কর্তৃক বনায়নের নামে অবৈধভাবে অধিগ্রহণকৃত স্থায়ী বাসিন্দাদের জমি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (২৮) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (২৯) মাদকাসক্তি, ড্রাগ, জুয়া ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপসহ অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অধিকতরভাবে রুখে দাঁড়ানোর কার্যক্রম জোরদার করা; (৩০) তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় পুলিশবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে পাহাড়ী পুলিশ কর্মকর্তা ও কনষ্টেবলদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলীর দাবী জোরদার করা; (৩১) পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের স্বার্থ পরিপন্থী যে কোন এনজিও কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিরোধিতা করা; (৩২) বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে অধিকতরভাবে অংশগ্রহণ করা এবং (৩৩) বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অধিকতরভাবে সামিল হওয়া।

১০ নভেম্বর মহান নেতা এম এন লারমা স্মরণে স্মরণ সভা

চুক্তিটা এখনো কাগজে কলমে আবদ্ধ - সন্তু লারমা

১০ নভেম্বর ২০০২ ছিল জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯ তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জনগণের জাতীয় শোক দিবস। মহান নেতার চেতনায় শাণিত হয়ে সকল বিভেদপন্থা ও অপশক্তিকে রোধ এবং জাতীয় ঐক্যকে সমুন্নত রেখে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবী জানিয়ে এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। খাগড়াছড়ি জেলা সদরের এম এন লারমার ভাস্কর্য পাদদেশে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। এতে সভাপতিত্ব করেন শ্রী মংসাপ্রু কার্বারী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্র শেখর চাকমা, বাংলাদেশ গণফোরাম এর প্রেসিডিয়াম সদস্য শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য, সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মঞ্জুরুল আহসান খান, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড হায়দার আকবর খান রনো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মেসবাহ কামাল, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা গৌতম কুমার চাকমা ও সুধাসিন্ধু খীসা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র নাথ সরেন, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি প্রভাকর চাকমা, রাঙামাটি জেলা সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দেব, জনসংহতি সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জড়িতা চাকমা, জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলার সভাপতি কে এস মং মারমা, আদি ও স্থায়ী বাঙালি কল্যাণ পরিষদ নেতা গফুর আহমেদ তালুকদার, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা।

১০ নভেম্বরের প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন যে, ১০ নভেম্বরে চার কুচক্রী গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশ এর নেতৃত্বে যে আক্রমণ, সেই আক্রমণে আমিও একজন শিকার ছিলাম। কিন্তু আমি প্রাণে বেঁচে গেছি। সেই ১০ নভেম্বরের দুঃসহ মুহূর্তগুলো আমার এখনও মনে ভাসে, অন্তরকে বিদ্ধ করে। যার যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশ চক্র কোন না কোনভাবে পার্টির ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল। তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি কিন্তু তারা জুম্ম জাতির সবচেয়ে প্রিয়জনকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে আরও অনেক সংগ্রামী-বিপ্লবী বন্ধুকে। যাদের অবদান আজকে আমি ১০ নভেম্বর ২০০২ সালে স্মরণ করছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'আজকে আমরা যদি দেখি এই পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধিকার-অধিকার ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর প্রায় ৫ বছর আগে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেই চুক্তিতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, এই চুক্তিটা এখনো কাগজে কলমে আবদ্ধ। তার বাইরে আমরা কোন সম্ভাবনার দিক খুঁজে পায় না। এখনো পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। তিনি প্রশ্নের সুরে বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি আমাকে বলেছিলেন যে, আপনি অবশ্যই আপনার চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়ন ও শান্তি আনয়নের জন্য আমাকে সহযোগিতা করবেন। আপনি বলেছিলেন যে, আমাদের জন্য চিন্তা করেন, আপনি আমাদেরকে ভালবাসেন। কিন্তু আজ অবধি আমরা সেই ভালবাসার ছোঁয়া এখনও পাইনি। আপনার ভালবাসার ছোঁয়া এখনও পাহাড়ী-বাঙালি স্থায়ী মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি।' তিনি ইউপিডিএফ ও প্রশাসন প্রসঙ্গে বলেন যে, 'এখনও পাহাড়ের বুকে ইউপিডিএফ নামধারী সন্ত্রাসী দল রক্তের হোলি খেলা খেলছে। নিরীহ মানুষদেরকে হত্যা করছে। অপহরণ করে, মুক্তিপণ দাবী করে পার্বত্য অঞ্চলে সন্ত্রাস, বিভীষিকা সৃষ্টি করে চলেছে। পার্বত্য অঞ্চলে নিযুক্ত সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন কর্মকর্তাদের একটি বিশেষ মহল কোন না কোনভাবে ইউপিডিএফকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে।'

মঞ্জুরুল আহসান খান বলেন, জুম্ম জনগণের মহান নেতা, সাহসী যোদ্ধা, বিপ্লবী এবং মেহনতী মানুষের নিবেদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতি আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার যে আদর্শ সেই আদর্শকে কোনদিন কেউ হত্যা করতে পারবে না। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই যে চুক্তি হয়েছে কিন্তু সেই চুক্তিকে কার্যকর করা হচ্ছে না। অতীতে যারা সরকারে ছিল তারাও চুক্তি লংঘন করেছে। শুধু লংঘন করে নাই, নানাভাবে ষড়যন্ত্র করেছে। বর্তমানে যে সরকার ক্ষমতায় আছে তারাও চুক্তিকে বাস্তবায়িত করছে না। তাই এই চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম শুধু জুম্ম জনগণের সংগ্রাম নয়, এটা বাংলাদেশের সংগ্রাম। সারা বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে গণ ফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পংকজ ভট্টাচার্য বলেন, 'এই বিপ্লবী নেতার সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ১৯৫৮ সনে। '৫৮ ও '৫৯ এই দুবছর একসাথে পড়াশুনা করেছিলাম চট্টগ্রাম কলেজে।' বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা হায়দার আকবর খান রনো বলেন - একটি জাতিকে, অনেকগুলি ছোট ছোট জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মুক্তি সংগ্রামে তিনি প্রেরণা দিয়েছিলেন, তাদের জাগিয়ে তুলেছিলেন এমন একজন মানুষ বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি শুধুমাত্র এই অঞ্চলের নয়, বাংলাদেশের এবং সমগ্র পৃথিবীর যে সমস্ত জাতি মুক্তি সংগ্রামের নেতা ছিলেন তাঁদের কাতারে তাঁর স্থান রয়েছে। আমি শুধু সরকারকে বলতে চাই - ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে, বাম ফ্রন্টের পক্ষ থেকে, যে চুক্তি করা হয়েছে তা যেন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হয়।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে আরও কত বছর লাগবে আমি জানি না। একজন বাঙালি হিসেবে আমি লজ্জাবোধ করি এই বাঙালি প্রাধান্য সরকারগুলো এই চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারটা নিয়ে তালবাহানা করছে, গড়িমসি করছে। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পথে আপনাদেরকে যেতে হবে। জনসংহতি সমিতির জনসংস্থা বিষয়ক সম্পাদক গৌতম কুমার চাকমা বলেন, আমি যা দেখেছি জীবনযাপনে এম এন লারমা ছিলেন অতি সাধারণ, তাঁর মন ছিল মহৎ। চিন্তা-চেতনায়-আদর্শে ছিলেন অতি উন্নত। তিনি সত্যিকারভাবে নেতা ছিলেন। সমিতির অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা সুধাসিন্ধু খীসা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে আজকে কালো মেঘের ঘনঘটা। জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আজকে আপনারা এই সংকটময় কঠিন মুহূর্তে এসেছেন। আমি মনে করি আপনারা অত্যন্ত যথাসময়ে এসেছেন।' জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র নাথ সরেন বলেন, বাংলাদেশের সমস্ত আদিবাসীরা তাদের ঘর থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, বিতাড়িত হচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাই আসুন আমরা এক পতাকাতলে শ্লোগান দিই। এদেশের আদিবাসীরা এদেশে থাকবে। এই লাল মাটি কামড়ে ধরে থাকবে।' সঞ্জীব দ্রং বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুতে সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি। সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম সফল করার মধ্য দিয়ে এম এন লারমার স্বপ্ন পূরণ করতে হবে।

এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ১০ নভেম্বর পালিত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর তারিখে বিভেদপন্থী, বেঈমান গিরি-দেবেন-পলাশ-প্রকাশ চক্রের এক অতর্কিত আক্রমণে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার আটজন সহযোদ্ধাসহ শহীদ হয়েছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে আলোচনাসভা ও গণ-সমাবেশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে গত ২ ডিসেম্বর ২০০২ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৫ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় আলোচনা সভা এবং তিন পার্বত্য জেলায় গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য দীর্ঘ শান্তি সংলাপের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিগত সরকার চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলি অবাস্তবায়িত রেখে তার মেয়াদ পূর্ণ করে। তাই চুক্তির পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও সরকার চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলি বাস্তবায়ন তো করছেই না বরং বিভিন্নভাবে চুক্তি লংঘন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের পর বিএনপির নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার গঠন করার পর এই প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। তাই এবারের চুক্তি বর্ষপূর্তি পালন ছিল নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকায় আলোচনা সভা

ঢাকার রমনাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। আলোচনা সভার শুরুতে শ্রী লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক অবস্থা, চুক্তির প্রেক্ষাপট, চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি বাস্তবায়ন ও চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পাহাড়ী জনগণ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। যে কোন সময় তাদের জীবন হরণ হতে পারে। সরকারের সদিচ্ছার অভাবই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাধা। তিনি আরো বলেন, চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে তজ্জন্য সরকারের একটি বিশেষ মহল ইউপিডিএফ নামধারী সশস্ত্র গ্রুপকে লালন পালন করে আসছে এবং তাদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের কতিপয় অঞ্চলে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন এক বিশাল কারাগারে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙ্গালী স্থায়ী বাসিন্দারা পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক কারাগারে মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের পরিবর্তে সেনাবাহিনী দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্যাতন করা হচ্ছে। অথচ তাদের কোন বিচার হচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে যত বিলম্ব হবে ততই পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হবে। অবিলম্বে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জোট সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

অন্যান্যদের মধ্যে আলোচক হিসেবে সভায় বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ গণ ফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি কমরেড রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জবাব আব্দুল জলিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামান, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মেজর জেনারেল সি আর দত্ত, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর সভাপতি কমরেড হাসানুল হক ইনু, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)এর সভাপতি কমরেড নুরে আলম জিকু, জাসদের প্রধান উপদেষ্টা জনাব আ স ম আব্দুর রব, দৈনিক সংবাদের সম্পাদক জনাব বজলুর রহমান, দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান, নিজেরা করি-এর নির্বাহী পরিচালক মিজ খুশী কবির, এমপি প্রমোদ মানকিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মেসবাহ কামাল, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব মামুনুর রশীদ, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ-সভাপতি শ্রী রবীন্দ্র নাথ সরেন এবং আদি ও স্থায়ী বাঙালি কল্যাণ পরিষদের নেতা জনাব মোস্তাফিজুর রহমান। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী শক্তিপদ ত্রিপুরা। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান। এতে উপস্থাপনা করেন তনয় দেওয়ান। আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমতল অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ ও ঢাকাস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

রাঙামাটির সমাবেশ

রাঙামাটি ষ্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে শ্রী গুণেন্দু বিকাশ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার গণসমাবেশ। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা শ্রী গৌতম কুমার চাকমা। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্রী লক্ষী প্রসাদ চাকমা। আরও বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি কমরেড শাহ আলম, জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী চন্দ্রশেখর চাকমা, আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য জনাব নুরুল আলম, বিশিষ্ট সমাজ সেবক শ্রী নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, আদি ও স্থায়ী বাঙালি কল্যাণ পরিষদের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলম, জনসংহতি সমিতির ভূমি ও আইন বিষয়ক সহ সম্পাদক এডভোকেট শক্তিমান চাকমা, আদি ও স্থায়ী বাঙালি কল্যাণ পরিষদ নেতা মোঃ জাকের হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা শ্রী সুনীতি বিকাশ চাকমা, পিসিপির সাধারণ সম্পাদক সুদীর্ঘ চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সদস্য এম জিসান বখতিয়ার ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী অরুমিতা চাকমা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, চুক্তি বাস্তবায়ন ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান হতে পারে না। বক্তারা অবিলম্বে চুক্তির মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। রাঙ্গামাটিতে সমাবেশ শুরু হওয়ার আগে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী ও উদীচী শিল্পীবৃন্দ গণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

খাগড়াছড়ির সমাবেশ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় এম এন লারমার ভাস্কর্যের পাদদেশে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জনসংহতি সমিতির জেলা শাখার সভাপতি শ্রী ধীর কুমার চাকমা। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা। আরও বক্তব্য রাখেন ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য কমরেড ফজলে হোসেন বাদশা, গণ ফোরাম এর সম্পাদক কমরেড সাইফুদ্দিন মানিক, ১১ দলের সমন্বয়ক ও সাম্যবাদী দলের সম্পাদক কমরেড দিলীপ বড়ুয়া, জনসংহতি সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্রী তাতিন্দ্র লাল চাকমা, সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য শ্রী সাথোয়াই প্রু মারমা, সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শ্রীমতি জড়িতা চাকমা, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক শ্রী সন্তোষিত চাকমা বকুল ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রী উজ্জ্বল চাকমা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। কিন্তু তারা চুক্তি বাস্তবায়ন না করে বরং পার্বত্যাঞ্চলে নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছে। বর্তমান সরকারেরও একটি স্বার্থান্বেষী বিশেষ মহল বিগত সরকারের মত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

বান্দরবানের সমাবেশ

বান্দরবান প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি শ্রী কে এস মং মারমা। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মঞ্জুরুল আহসান খান এবং জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক শ্রী ঊষাতন তালুকদার। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সভানেত্রী শ্রী উনু প্রু মারমা, সমিতির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী চিংহ্লামং চাক, সিপিবি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কমরেড দীলিপ দেব, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতি থুইম্রানু মারমা ও জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রী উচ মং মারমা।

সমাবেশের প্রধান অতিথির বক্তব্যে মঞ্জুরুল আহসান খান বলেন, চুক্তি স্বাক্ষর করেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না করার ফলে শান্তিকামী জুম্ম জনগণের সাথে চরমভাবে বেঈমানী করেছেন। চুক্তি বাস্তবায়ন না করে প্রতিক্রিয়াশীলদের ইচ্ছাপূরণ করলেও কিন্তু তাঁরা ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে ষড়যন্ত্র করে ঠেকিয়ে রাখা যায় না বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে চুক্তির মৌলিক শর্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। জনসংহতি সমিতির অন্যতম নেতা উষাতন তালুকদার বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মত বর্তমান সরকারও চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে চুক্তি লঙ্ঘন শুরু করেছে। চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির মালিকানা হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ সরকারের ছত্রছায়ায় স্থানীয় প্রশাসন সেনাবাহিনী, বনায়ন এবং ব্যক্তিমালিকানা খাতে শত শত একর পাহাড়ী জমি হস্তান্তর করেছে। তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, চুক্তি বাস্তবায়ন করা না হলে ভবিষ্যতে অবনতিশীল পার্বত্য পরিস্থিতির জন্য সরকারকেই দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।

আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের অধিবেশনে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি

২-১৩ ডিসেম্বর ২০০২ জেনেভাস্থ জাতিসংঘ অফিসে খসড়া আদিবাসী অধিকার ঘোষনাপত্র বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের ৮ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বের মোট ৩৭টি দেশের ৯৬ জন প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (নিবন্ধিত) ১৫টি এনজিও-এর ৬৫ জন প্রতিনিধি, ইকোসক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ১২টি আদিবাসী সংগঠনের ৫৮ জন প্রতিনিধি এবং আদিবাসী জাতি, সংগঠন ও দলের ৫৬ জন প্রতিনিধি ও একাডেমিকস ও অন্যান্য থেকে ২৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা অংশ গ্রহণ করেন। এবারের অধিবেশনে আদিবাসী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, ভূমি অধিকার, সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত অধিকার ইত্যাদি সম্বলিত অনুচ্ছেদগুলোর উপর সবিশেষ আলোচনা করা হয়। কয়েকটি দেশের সরকারী প্রতিনিধি খসড়া ঘোষণাপত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোর নতুন সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করে যা অধিকাংশ আদিবাসী প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আদিবাসী প্রতিনিধিদের মতে খসড়া ঘোষণাপত্রে সন্নিবেশিত অধিকারগুলো আদিবাসীদের জন্য ন্যূনতম এবং তাই এই খসড়া ঘোষণাপত্র কোন সংশোধনী ছাড়াই গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সনে সাব-কমিশন অন প্রিভেনশন অফ ডিসক্রেমিনেশন এন্ড প্রটেকশন অফ মাইনোরিটি কর্তৃক ৪৫টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত আদিবাসী অধিকার বিষয়ক সনদপত্র প্রণীত হয়। প্রণয়নের পর বিগত আট বছর ধরে আলোচিত হয়ে আসছে। কিন্তু ৪৫টি অনুচ্ছেদের মধ্যে মাত্র নাগরিকত্ব বিষয়ক ৫নং অনুচ্ছেদ এবং অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আদিবাসী নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক ৪৩নং অনুচ্ছেদ এপর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য যে, ৯ম সেশন অনুষ্ঠিত হবে ১৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে।

কাচালং কলেজের নবীনবরণে সন্ত্র লারমা

গত ১৮ ডিসেম্বর রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি থানার কাচালং কলেজ শাখা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত নবীনবরণ ও বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা। পিপল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য প্রভাত কুমার চাকমা, পিসিপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তনয় দেওয়ান, বাঘাইছড়ি থানার ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

নবীন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ফুলের তোড়া ও মানপত্র প্রদান করে বরণ করা হয় এবং ডিগ্রি পরীক্ষার্থী ছাত্রদের ফুলের তোড়া প্রদানের মাধ্যমে বিদায় জানানো হয়। নবীন তথা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন যে, ৩১ বছর অতিক্রান্ত হলেও দেশের শাসকগোষ্ঠী একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারেনি। ক্ষমতায় যাবার জন্য নিজ দলীয় স্বার্থে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করেছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে শাসকগোষ্ঠীগুলো কাজ করেছে। ফলে ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সৃষ্টিতে এই শিক্ষাব্যবস্থা বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ছাত্র সমাজ প্রকৃত মানুষের মুল্যবোধ অর্জন করতে পারছে না। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ, সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে লংঘিত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, দেশের সরকারগুলো সবসময় শিক্ষাকে অবহেলা করে চলেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার কোন সুরাহা করা হয়নি। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার অবস্থা আরও নাজুক। এখানে শিক্ষাক্ষেত্রে চরমভাবে উদাসীনতা দেখানো হচ্ছে। অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী ও স্থানীয় অতিথি শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সেনা নির্যাতনের শিকার পিসিপি সদস্য মিলন চাকমা

সম্প্রতি রাঙামাটি জেলা শহরে সেনা-পুলিশের যৌথ বাহিনীর সদস্যদের কর্তৃক পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এক সক্রিয় কর্মী মিলন চাকমা এবং অপর এক নিরীহ ছাত্র জেনী তঞ্চঙ্গ্যাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার ও নির্মমভাবে শারিরীক নির্যাতন চালানো হয়েছে। প্রায় মৃত অবস্থায় তাদেরকে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে পুলিশ হেফাজতে ভর্তি করা হলে জনতার তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ নভেম্বর দিবাগত রাত আনুমানিক ১টায় রাঙামাটি শহরের ট্রাইবেল আদামে যৌথ বাহিনীর অভিযান চলাকালীন সময়ে বিনা অভিযোগেই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মী মিলন চাকমা (১৬) পীং জয় লক্ষণ চাকমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে গ্রেফতার করা হয়। পরে একই এলাকার নিরীহ ছাত্র জেনী তঞ্চঙ্গ্যাকেও গ্রেফতার করা হয়। উভয়কে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে কোতয়ালী থানায় সোপর্দ করা হয়। তার আগে সেনা সদস্যরা মিলন চাকমাকে সে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের মিছিলে যায় কিনা প্রশ্ন করে এবং কোথায় অস্ত্র রেখেছে এধরনের উদ্দেশ্যমূলক অভিযোগ তুলে নির্দয়ভাবে মারধর করে। বর্তমানে তাদেরকে ডিটেনশন দেয়া হয়েছে।

ইউপিডিএফ কর্তৃক সরকারী শিক্ষক বিমল চন্দ্র চাকমা অপহৃত

৫/১১/০২ মঙ্গলবার রাঙামাটি সদর থানার বন্দুকভাঙ্গা ইউপির খারিক্ষ্যং হতে সরকারী শিক্ষক বিমল চন্দ্র চাকমা (৪০) ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দ্বারা অপহৃত হন। অপহরণের পর সন্ত্রাসীরা ছয় লক্ষ টাকার মুক্তিপণ দাবী করেছে। তার ছেলে বাতায়ন চাকমা চুক্তি পক্ষের পিসিপিতে কাজ করায় ইউপিডিএফ সদস্যরা তার বাবাকে অপহরণ করেছে বলে জানা গেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তাকে ছেড়ে দেয়নি।

বালুখালীর বাদলছড়িতে ইউপিডিএফ চক্রের সন্ত্রাস

রাঙামাটি সদর থানাধীন বালুখালী ইউনিয়নের বাদলছড়িতে গত ১৬ ডিসেম্বর রাত ৮টার দিকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী দীপেন্দু চাকমার নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল হঠাৎ গ্রাম ঘেরাও করে গ্রামবাসীদের সন্ত্রস্থ করে তোলে। তারা গ্রাম প্রধান পনচোগা কার্বারী (৪৫)-কে জনসংহতি সমিতি সমর্থন করায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। একপর্যায়ে ১১ জনকে বন্দী করে অপহরণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের কাছে খবরটি ছড়িয়ে পড়লে গ্রামবাসীরা সদলবলে বাদলছড়ি গ্রামবাসীদের উদ্ধার করতে আসে। এক পর্যায়ে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে রনেল চাকমা (২২) (বিএ পরীক্ষার্থী) নামে জনৈক ছাত্রকে অপহরণ করে চলে যায়। তার পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চাকমা ছেলের কি অপরাধ তা জানতে চাইলে তাকেও মারধোরের হুমকি দেয়। তবে ছাত্রটি চুক্তিকে সমর্থন করে এটাই তার ইউপিডিএফ চক্র কর্তৃক অপহৃত হবার কারণ বলে ধারণা করা হয়। রনেল চাকমা অপহৃত হওয়ায় সারা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের মোকাবিলা করার জন্য সংগঠিত হতে থাকে। জনগণের তীব্র রোষ আর প্রতিরোধ দেখে ইউপিডিএফ চক্র তার পরের দিন ১৭ ডিসেম্বর ২০০২ বিকেল ৩টার দিকে রনেল চাকমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তবে রনেল চাকমাকে এই হুশিয়ারী প্রদান করা হয় যে, চুক্তি সমর্থিত পিসিপির কাজে জড়িত হয়েছে প্রমাণ পেলে তার বাবা, কাকা ও বড় ভাই প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে মোট ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। তারা আরও হুমকী প্রদান করেছে যে, ১৪ দিনের মধ্যে বালুখালীর সকল পিসিপি ও জেএসএস কর্মীদেরকে তাদের কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে। অন্যথায় নির্বিচারে গুলী করে হত্যা করা হবে। এই নিয়ে এলাকায় চরম নিরাপত্তাহীনতা ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ইউপিডিএফ কর্তৃক চা বাগানের ম্যানেজার অপহৃত

গত ২৯ অক্টোবর ২০০২ রাঙ্গুনীয়ার রাণীরহাট এলাকার ঠান্ডাছড়ি চা বাগানের ম্যানেজার কাজী নুরুল আনোয়ার জাহাঙ্গীর (৩০) ইউপিডিএফ সশস্ত্র সদস্যদের দ্বারা অপহৃত হন। অপহরণ ঘটনার পর বাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তারা রাণীরহাট বাজার এলাকায় পাহাড়ীদের উপর চড়াও হয়। তারা বাজারে, অফিসে ও স্কুলে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে পাহাড়ীদের উপর বাঁধা-নিষেধ আরোপ করে। এতে একদিকে ইউপিডিএফ কর্তৃক অপহরণ ও সন্ত্রাস এবং বাঙালিদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক কার্যক্রমের ফলে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটছে। এই অপহরণ ঘটনাকে পুঁজি করে সেনাবাহিনী এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী চরম সুযোগ নিচ্ছে। তারা ইউপিডিএফকে একদিকে সন্ত্রাসে মদত যোগাচ্ছে অন্যদিকে ইউপিডিএফ কর্তৃক বাঙালী অপহৃত হলে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে উস্কানি দিয়ে চলেছে।

সুমন সহায়তা তহবিল গঠনে বাধাপ্রদান ও মারধোর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের মেধাবী ছাত্র সুমন চাকমার চিকিৎসার জন্য তহবিল সংগ্রহে বাঁধা প্রদান করে চরম অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে ইউপিডিএফ চক্র। গত ১২ ডিসেম্বর তহবিল সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মিলন চাকমা (প্রাচ্য ভাষা, ২য় বর্ষ) ও সুযশ চাকমা (বিবিএ, ৩য় বর্ষ) খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর বাজারে গেলে স্বর্ণজ্যোতি, মিল্টন চাকমা, স্বপন চাকমা, সৌমিত্র চাকমা ও জয়মোহন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বাঁধা প্রদান করে। এসময়ে ছাত্ররা সুমন চাকমার অসুস্থতার কথা তাদের কাছে তুলে ধরলেও সন্ত্রাসীরা সুযশ চাকমাকে মারধর করে। পরে সুযশ চাকমার পরিবারে খবরটি পৌছলে তার চাকুরীজীবি বাবা সেখানে উপস্থিত হয় এবং সুযশ

চাকমার অপরাধ সম্পর্কে জানতে চাইলে পরে সন্ত্রাসীরা সুযশ চাকমার বাবার কাছ থেকে মুচলেকা নেয় যে, সুযশ চাকমা আর কোনদিনও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কাজ করতে পারবে না। সুযশ চাকমা কোন প্রকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কাজে লিপ্ত হলে তাকে মেরে ফেলা হবে। সন্ত্রাসীরা বেলা ১২টা হতে বিকেল পর্যন্ত সুযশ ও মিলনকে আটকে রেখেছিল। উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুমন 'টিউমার এন্ড সেন্ট্রাল ডিস্ক প্রোলাপস ইন লামবার ভাইব্রা' রোগে আক্রান্ত। তার গরিব জুম চাষী পিতার পক্ষে তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা যোগানো সম্ভবপর নয়। তাই তার সহপাঠিরা সুমনের প্রতি মানবিকতার হাত বাড়িয়ে সমাজের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছিল। সেই অর্থ সংগ্রহে ইউপিডিএফ চক্রের এহেন বর্বর ও নির্দয়তায় খাগড়াছড়িবাসী হতবাক হয়েছে।

ইউপিডিএফ কর্তৃক ইউপি সদস্য অপহরণ

২৯ অক্টোবর ২০০২ সন্ধ্যায় ইউপিডিএফ এর এক সশস্ত্র দল নানিয়ারচর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য প্রহ্লাদ চাকমা (৪৫)-কে বাজার এলাকা হতে অপহরণ করেছে। অপহরণকারী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণ হিসেবে ৪ লাখ টাকা দাবী করে। শুধু তাই নয় ৩০ অক্টোবর একই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মানিক্যধন চাকমা (৪৫) খুল্যাংপাড়ার নিজ বাড়ী থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হন এবং মুক্তিপণ হিসেবে ১ লক্ষ টাকা দাবী করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এর পর দিন ৩১ অক্টোবর নানিয়ারচরের নোয়াদম পাড়া হতে রাত্রে মাণিক্য সেন চাকমা (৪০) নামের একজন চুক্তি সমর্থক ব্যক্তি অপহৃত হন। তার মুক্তিপণ হিসেবে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ২ লক্ষ টাকা দাবী করেছে। পর পর তিনটি অপহরণ ঘটনায় এলাকায় চরম নিরাপত্তাহীনতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ২ নভেম্বর ২০০২ তারিখে ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মাণিক ধন চাকমা ও ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে মাণিক্য সেন চাকমাকে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ পর্যন্ত প্রহ্লাদ চাকমার ভাগ্যে কি জুটেছে তা এখনও জানা যায়নি। ইউপিডিএফ নেতা আনন্দ প্রকাশ চাকমা ও সচিব চাকমার নেতৃত্বে চুক্তি স্বাক্ষরের পর হতে এই এলাকায় একের পর এক অপহরণ, হত্যা ও চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব থাকায় জনমনে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

রেডিও নেদারল্যান্ডস-এ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন

গত ৬ ডিসেম্বর ২০০২ রেডিও নেদারল্যান্ডস এর ওয়েবসাইট-এ "Resentment in the Hills" শীর্ষক শাকিল ফয়জুল্লার একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জনৈক অরূপ চাকমা। উক্ত সাক্ষাৎকারে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সরকারের বিরুদ্ধে চুক্তির প্রতি সম্মান না দেখানো ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ আনেন। তিনি আরো বলেন, "ইতিমধ্যে পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু চুক্তি এখনো যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। তাই বিশেষ করে আদিবাসী জনগণ দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছে। উপরন্তু আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন দেখতে পাই যার ফলে সাধারণ মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে না, বেঁচে থাকার জীবিকা খুঁজে পাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ সবসময় ভীতসন্ত্রস্থ অবস্থায় দিনযাপন করছে।"

রাঙ্গামাটির জনৈক কিশোর অরূপ চাকমা বলেন, "আদিবাসীরা স্থায়ী বাঙ্গালী যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক আগে থেকে বসবাস করে আসছে তাদের প্রতি খুবই আন্তরিক। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীরা পাহাড়ীদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে না। সেজন্য তাদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে...। কিন্তু সরকার যদি চুক্তি বাস্তবায়ন না করে তাহলে আমাদের জীবন কোনমতেই ভালো হতে পারবে না।"

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান সাক্ষাৎকারে বলেন, "পার্বত্য অঞ্চলে বিবাদমান বিভিন্ন আদিবাসী দলের মধ্যে সহিংসতা বন্ধ করার জন্যে এ অঞ্চলে বেশী করে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "আমরা অর্থনৈতিক সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জনিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, কিন্তু আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করছি। পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই। কিন্তু দুটি দল [আদিবাসীদের মধ্যে] এখনো পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। একটি দল চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে, অন্যদল চুক্তির বিরোধিতা করছে। এটা স্পষ্ট যে, এ দু'দলের সংঘর্ষের কারণে আমাদের ভোগান্তি হচ্ছে। এটাই সত্য যে, এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। Source: http://www.mw.nl/hotspots/html/ban021206.html

শোক সংবাদ

বিশিষ্ট সমাজ সেবক, লেখক ও চিকিৎসক ডা. ভগদত্ত খীসা গত ১লা ডিসেম্বর দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলে উত্তর কালিন্দিপুরস্থ নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে আমাদের ছেড়ে চলে যান। তাঁর এই মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। সমিতি শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। তিনি ১৯৩৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর নান্যাচর থানার সাবেক্ষ্যং গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণমোহন খীসা। তিনি ১৯৬৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী থেকে রাঙামাটির রিজার্ভবাজারে তার পেশাগত জীবন শুরু করেন। সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতিগুলোকে বিদ্রুপ করে লেখা তার ছড়া ও লিমেরিক গোটা সমাজকে নাড়া দিয়েছিল। তিনি প্রবন্ধকার, ছড়াকার হিসেবে তথা সাহিত্যিক হিসেবে জুম্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

Message of the UN High Commissioner for Human Rights

6 December 2002

We commemorate today the creation of one of the most important testaments of our times: the Universal Declaration of Human Rights. This is an occasion to reflect on our human rights achievements as well as to rededicate ourselves to overcoming our shortcomings.

The Declaration is a timeless and powerful document that captures the profound aspirations of humankind to live in dignity, equality and security. It provides minimum standards and has helped turn moral issues into a legally binding framework. Today, human rights, as protected by the rule of law, are now demanded by civil society. They are adopted as pillars of domestic and foreign policy. They are invoked by parliaments, national and international judiciaries, the media, schools, workers, employers and corporations.

Yet, we are living in profoundly challenging times for human rights. On this day, I would like us to think in particular of the countless number of civilians who are living in the midst of war and conflict and who continue to endure atrocities which should outrage the conscience of humanity. Their basic rights, though enshrined in human rights and humanitarian law, are denied. For many, war is distant and the graphic images of human suffering enter their lives only through the media. But for the millions of victims of armed conflict, war represents the daily reality. Men and women are killed, maimed, raped, displaced, detained, tortured, and denied basic humanitarian assistance, and their property destroyed because of war. Children are abducted, forcibly recruited into arms, separated from their families, sexually-exploited, suffer hunger, disease and malnutrition, and are unable to go to school. They are not only denied their present, but also their future.

It is appalling that impunity for gross violations of human rights and grave breaches of humanitarian law is so rampant. The entry into force of the Rome Statute of the International Criminal Court on 1 July 2002 has given great hope for finally bringing an end to genocide, war crimes and crimes against humanity. Let us work together towards ensuring the success of this much-needed institution.

But we need to do a lot more. We must look with renewed urgency to means that will truly promote and protect human rights in areas ravaged by conflict. Let us pursue a comprehensive strategy focusing most importantly on ensuring that conflict is in the first place prevented, while seeking also to protect civilians caught in the cross-fire, helping to achieve peace, and assisting in rebuilding war-torn societies on solid foundations of respect for human rights.

The best chance for preventing, limiting, solving and recovering from conflict and violence lies in the restoration and defence of the rule of law. Armed conflict stands as a bloody monument to the failure of the rule of law. We must break the cycle of violence. Where armed repression strips people of their rights and dignity, let those responsible answer under the rule of law. Where terrorism inflicts misery, let those responsible answers under the rule of law. Let the fundamental rules of human rights and human dignity applies to every state and every armed group, every individual and every collective, every public entity and every private corporation.

Sergio Vieira de Mello
High Commissioner for Human Rights

Statement by the Indigenous Caucus

10 December 2002

This statement is issued by representatives of Indigenous Peoples, nations and organizations who are meeting in Geneva on the occasion of Inernational Human Rights day, 10 December 2002.

As the world community may know, the United Nations draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples represents a state of the minimum standards by which Indigenous Peoples will be able to maintain and sustain their distinct nations, peoples and communities.

We call upon the United Nations to confirm the rights of Indigenous Peoples, so that marginalisation and manifest discrimination against Indigenous Peoples around the world can be addressed.

At this time, State members of the United Nations continue to express an unwillingness to recognize and respect our fundamental collective and individual human rights, including that of self-determination, which is considered a pre-requisite to the exercise of all rights.

Indigenous Peoples are Peoples and have the full right to self-determination.

The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples was approved by the Sub-Commission on Prevention of discrimination and Protection of Minorities eights years ago, but only two of the forty five (45) articles have been subsequently endorsed in the working group.

That achievement was made five years ago, in the second session of the working group. Progress has been unnecessarily slow.

The Member states of the United Nations should be more motivated to achieve the objective of the adoption of the Declaration with in the International Decade of Indigenous Peoples, that is, by Year 2004. But our rights, as affirmed in the declaration, must not be compromised in that time.

Presently, some States are not prepared to recognize the universality of the human rights which apply to Indigenous Peoples.

However, we also note that a growing number of States are prepared to adopt the declaration without amendment.

We are encouraged by this support and request all States to seriously consider adoption of the declaration in the original text.

Clearly, the reticence of some States to make their domestic policies subject to international standards has to be overcome.

We reject the erroneous allegations that Indigenous Peoples are not prepared to consider reasonable changes to the Declaration. We have always made it clear that any proposals for change should comply with the principles of equality, non-discrimination and the absolute prohibition of racial discrimination, which is peremptory norm under international law.

In this regard, nation state members of the United Nations have no authority to advance proposals and positions which are inconsistent with these principles or which violate existing peremptory norms.

This is a violation of the fundamental principle that human rights are universal, and would undermine the existing rights embraced by the United Nations Charter and the International Bill of Rights.

BACKGROUND

Approximately two hundred delegates, representing Indigenous Peoples, nations and organizations from all regions of the world, are participating in a United Nations meeting in Geneva to consider the draft Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. The Declaration affirms that Indigenous Peoples are equal in dignity and rights to all other peoples recognizes the right of all peoples to be different, to consider themselves different, and to be respected as such. The Declaration also affirms that all peoples contribute to the diversity and richness of civilizations and cultures, which constitute the common heritage of humankind. The Declaration affirms, promotes and protects the distinct rights of Indigenous Peoples, including self-determination and participation in decision-making; land rights and environment; religious practices; language and oral traditions; and access to education in our own language. The two articles which have been adopted in the first reading are as follows:Article 5Every indigenous individual has the right to a nationality.Article 43All the rights and freedoms recognized herein are equally guaranteed to male and female indigenous individuals.

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত।

শুভেচ্ছা মূল্য: ৬.০০ টাকা মাত্র

JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti(PCJSS)

Issue No. 29, 11 Year, December 2002, International Human Rights Day Issue

Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh. Phone: + 880-351-61248, E-mail: pcjss@hotmail.com

Price: TK. 6.00 Only